Vol. 39 | No. 1 | 1995

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

টাঙ্গাইলের প্রাচীন কবি টাঙ্গাইলের প্রাচীন কবি (ষোল শতক-আঠারো শতক)

Volume	39
Issue	1
Year	1995
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	জামরুল হাসান বেগ
Published online	October 1, 1995
DOI	10.62328/sp.v39i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v39i1.3
Pages	139-223
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৯ : সংখ্যা ১

টাঙ্গাইলের প্রাচীন কবি

(ষোল শতক-আঠারো শতক)

জামরুল হাসান বেগ

এক : ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যখন চণ্ডীদাস-কৃত্তিবাস-মালাধর বসু প্রমুখ পশ্চিম-বঙ্গীয় বাঙালি কবির সাহিত্যসৃষ্টির গৌরবে অভিষিক্ত, সেই সময়ে পূর্ববঙ্গের বিস্তৃত এলাকা (আধুনিক ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল-জামালপুর-কিশোরগঞ্জ অঞ্চল) যে সাহিত্যসৃষ্টির গৌরব থেকে বঞ্চিত ছিল, একথা সত্য নয়। এ-অঞ্চলের মনসামঙ্গলের কবি নারায়ণদেব স্বীয় পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব প্রতিভায় সৃষ্ট 'পদ্মাপুরাণ'-এর মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্বাধিক প্রচারের গৌরবই কেবল অর্জন করেননি, জনপ্রিয়তার বিচারেও এ-অঞ্চলের সাহিত্যরসিক মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রভাব ও জনপ্রিয়তা পরবর্তী সময়ে অন্যান্য কবিদের অনুপ্রাণিত করেছিল। তবে কেবল নারায়ণদেব একাকী এ অঞ্চলে সাহিত্যসৃষ্টির সামগ্রিক গৌরব নিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নিজস্ব আসন সৃষ্টি করেননি। পরবর্তী সময়ে এসেছেন, দ্বিজ বংশীদাস—মনসামঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ; চন্দ্রাবতী—'রামায়ণ'-এর কবি, যিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম মহিলা কবি। এঁরা তিনজনই আধুনিক কিশোরগঞ্জ জেলার অধিবাসী। এখানে স্মরণযোগ্য যে পূর্ববঙ্গের এই অঞ্চলের মধ্যে ভূমিগঠনগত বিচারে জামালপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জের চেয়ে টাঙ্গাইল জেলা-অঞ্চল প্রাচীনতর।[১]

পূর্বকালে টাঙ্গাইল জেলা-অঞ্চল প্রথমে 'সরকার' মাহমুদাবাদ, পরে সরকার বাজুহায় এবং তৎপরে আটিয়া ও কাগমারী—এই দুই পরগনা হিসেবে পরিচিত ছিল। মুঘল শাসক আকবরের শাসনামলে আবুল ফজল রচিত ইতিহাস গ্রন্থ 'আইন-ই-আকবরী' (১৫৮২ খ্রি:) কিংবা টোডরমলের 'ওয়াশিল তুমার জমা' বন্দোবস্ত- কাগজে আটিয়া ও কাগমারীর উল্লেখ থাকলেও, সে উল্লেখ পরগনা হিসেবে নয়। তখনও এ-দুটি অঞ্চল সরকার মাহমুদাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উল্লেখ্য: 'ওয়াশিল তুমার জমা' বন্দোবস্ত সূত্রে জানা যায়, তখন বাংলাকে উনিশটি 'সরকার'-এ এবং ছয়শ বিরাশিটি 'মহাল'-এ বিভক্ত করা হয়।[২] সেই সময় আটিয়া

ও কাগমারী 'মহাল'(প্রশাসনিক কেন্দ্র) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তবে সম্রাট শাহজাহানের আমলের (১৬৩১ খ্রি:) একটি ভূমিদান পত্রে আটিয়া-কে পরগনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে বলে মুহম্মদ সিদ্দিক খান তাঁর'এ স্টাডি ইন মুঘল ল্যান্ড রেভিনিউ সিস্টেম'-প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য: বার ভূঁইয়ার অন্যতম, সোনার গাঁয়ের অধিপতি ঈশা খাঁর আমলে বড়বাজু[৩] তাঁরই শাসনাধীন ছিল। ঈশা খাঁর মৃত্যু (১৫৯৯ খ্রি:)-র পর ও তাঁর বংশের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে বড়বাজু হাতছাড়া হয়ে যায় এবং পরবর্তী সময়ে অতি দ্রুত বড়বাজু-র অবয়বগত পরিবর্তন ঘটে; প্রথমে আটিয়া এবং পরে আটিয়া থেকে কাগমারী—ভিন্ন পরগনা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। নবাবী আমলেও আটিয়া ও কাগমারী স্বতন্ত্র পরগনা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলা প্রতিষ্ঠিত হলে আটিয়া ও কাগমারী এ-জেলার আওতাভুক্ত হয়; আটিয়া 'থানা'-য় পরিণত হয়। ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে এ-থানা নিকটবর্তী টাঙ্গাইলে স্থানান্তরিত হয় এবং মূলত আটিয়া ও কাগমারীর সমন্বয়ে গঠিত হয় টাঙ্গাইল মহকুমা। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে টাঙ্গাইল স্বতন্ত্র 'জেলা'-য় পরিণত হয়।

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকার প্রায় মধ্যভাগে অবস্থিত টাঙ্গাইল জেলার বিস্তৃতি ২৩°৫৯´ ৫০´´ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৪°৪৮´ ৫১´´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৪৮´ ৫০´´ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৯০°৫১´ ২৫´´ পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত।[৪] 'ভূতত্ত্বের দিক দিয়ে সমস্ত অববাহিকাটাই (বেঙ্গল ডেল্‌টা হিসেবে 'পরিচিত) অন্তরদেশের (মৃত্তিকাতলস্থিত স্তর) দিক দিয়ে উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমের কঠিন মালভূমি এবং দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্তী সন্ধিস্থলে অবস্থিত'।[৫] জেলার দক্ষিণে গাজীপুর, ঢাকা, মানিকগঞ্জ, পূর্বে গাজীপুর ও ময়মনসিংহ, উত্তরে জামালপুর ও ময়মনসিংহ এবং পশ্চিমে যমুনা নদী। জেলার বিশাল বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিরাজমান পাহাড়টিলা বেষ্টিত উচ্চভূমি মধুপুরের গড়। 'মধুপুর এলাকার পূর্ব ও দক্ষিণ সীমারেখা ধরে বরফযুগীয় স্তর[৬] ক্রমানুসারে অপেক্ষাকৃত আধুনিক অবক্ষেপণের তলদেশ দিয়ে বিস্তৃত। বর্ষাকালে যখন নদীগুলির বিপুল জলরাশি অনিবার্যরূপে অববাহিকার নিম্নাঞ্চলগুলি প্লাবিত করে, তখন ঢাকা থেকে জামালপুর পর্যন্ত বিস্তৃত রক্তিম ও কঠিন মৃত্তিকাময় সমগ্র অঞ্চলটাই প্লাবনসীমার ঊর্ধ্বে বিরাজ করে। সেখানে শুধু দেখা যায় সুগভীর ও স্বল্পপরিসর খাদে প্রবাহিত পাহাড়ী নদীগুলির সর্পিল প্রবাহ . একটা বৈচিত্র্যময়, বিচ্ছিন্ন আর সঙ্গতিচ্যুত ভূ-প্রকৃতি হলো টাঙ্গাইল জেলার বৈশিষ্ট্য। বন-বাদাড়, টিলা-উপত্যকা, অগভীর খাদ ও ঢেউ-খেলানো প্রকৃতি একে করে রেখেছে অনন্য। তাই টাঙ্গাইল জেলা শুধু একঘেয়ে প্রান্তর বা উর্বর সমতল ভূমিই নয়, এখানে একের পর এক বিস্তৃত রয়েছে বৃক্ষাচ্ছাদিত অসংখ্য প্রান্তর শ্রেণী।'[৭] তবে শুধু পাহাড়-টিলাই নয়, জেলায় নদ-

নদী বিল-ঝিলের প্রাধান্যও উল্লেখ করার মতো। জেলার পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত যমুনা নদী, প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে প্রবাহিত বঙ্গেশ নদী[৮] এবং প্রায় পশ্চিমাংশ দিয়ে প্রবাহিত ধলেশ্বরী নদী। এছাড়াও লৌহজং-ঝিনাই-লাঙ্গুলিয়া-এলঙ্গজানী-খিরু-আতাইসহ অনেক নদীর উপস্থিতি বর্তমানকালেও পরিদৃষ্ট হয়।[৮ক] আর আয়তন, গভীরতা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পরিবেশ বিচারে বিখ্যাত এ-জেলার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিলঝিল। সময়ের বিবর্তনে এবং বাৎসরিক পলিজ অবক্ষেপণে বর্তমানে সেসব বিলঝিলের অধিকাংশই চাষাবাদের উপযোগী হয়ে উঠলেও, এগুলোতে অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গৌরবময় স্বাক্ষর আজও বিদ্যমান। প্রধান বিলঝিলের মধ্যে হোগা বিল, চারান বিল, বার্তা বিল, তরলাই বিল, চাপড়া বিল, বাথুলী বিল, নিরাল বিল, মইষা বিল, বড়বিলা, নিকলা বিল, গরিবউল্লাহ্ বিল এবং তাড়িল্লাহ্ বিলের নামোল্লেখ করা যায়।[৮খ]

প্রাচীনতর এ-টাঙ্গাইল জেলার সহিত্যচর্চার ইতিহাসও প্রাচীন। লিখিত সাহিত্য এবং লোক সাহিত্য—উভয়ের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার এ জেলা। ষোল শতকের প্রথম পাদের গোড়ার দিকে টাঙ্গাইল জেলায় বৈষ্ণবধর্ম এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের রস-আস্বাদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়।[৯] এর প্রধান পুরুষ 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'- কাব্যের কবি মাধবাচার্য। অবশ্য এর আগেই এ-অঞ্চলের মানুষ 'মনসামঙ্গল'-এর পাঠক ও শ্রোতা হিসেবে মঙ্গলকাব্যের রস ও মাধুর্য উপলব্ধির সুযোগ লাভ করেন। কিশোরগঞ্জের কবি নারায়ণদেবের 'পদ্মাপুরাণ'-ই ছিল এর প্রধান আধার। শুধু টাঙ্গাইল অঞ্চলেই নয়, সমগ্র পূর্ববঙ্গ এমনকি আসামেও এ-কাব্যের ব্যাপক প্রচার ও জনপ্রিয়তা ছিল। টাঙ্গাইল-অঞ্চলে মনসামঙ্গল কাব্যের যে জনপ্রিয়তা, তার পিছনে ভৌগোলিক কারণই মুখ্য। পূর্ববঙ্গের এ-নীচু এলাকার মানুষ 'জলপ্লাবিত বর্ষাকালে ব্রহ্মপুত্রবাহিত আরণ্য-পার্বত্য' সর্পের ভয়ে সর্বদা ভীত থাকতো। তাই এ অবস্থায় সর্পদেবী মনসার কাছে শরণ-প্রার্থনার উদ্দেশ্যেই মনসামঙ্গল কাব্যের রচনা ও প্রচার এবং মনসার পূজা এ-অঞ্চলে ব্যাপক প্রসার লাভ করে।[১০] ষোল শতকেই এ-অঞ্চলের কবি শ্রীরায় বিনোদ রচনা করেন মনসার স্তুতিবিষয়ক কাব্য 'পদ্মাপুরাণ'। এ-কাব্য রচনার পরিপ্রেক্ষিতে টাঙ্গাইলবাসীরা তাদের এলাকাবাসী কবি-প্রণীত সাহিত্যের রস আহরণের মাধ্যমে গভীর ও নিবিড় পরিতৃপ্তি লাভে সক্ষম হয়। ষোল শতকে (মতান্তরে সতেরো শতকে) আবির্ভূত হন 'দুর্গামঙ্গল'-এর কবি ভবানীপ্রসাদ রায়; তিনি রচনা করেন দেবী দুর্গার মাহাত্ম্যপ্রকাশক মঙ্গলকাব্য। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ভবানীপ্রসাদ-ই একমাত্র জন্মান্ধ কবি। মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবং নিজস্ব অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ তাঁর এ-কাব্য। ষোল শতকেরই আর এক কবি রূপনারায়ণ ঘোষ রচনা করেন 'দুর্গামঙ্গল' কাব্য। দুর্গামঙ্গল কাব্য ছাড়াও মনসাকাহিনী ভিত্তিক 'ব্রহ্মাণী-বিজয়'-কাব্যেরও রচয়িতা

তিনি।[১১] এঁদের পরিচয়, কৃতিত্ব ও অবদান আজ আর অজানা নয়। আপন পাণ্ডিত্য-প্রতিভাবলে সাহিত্যের ইতিহাসে এঁরা বিশিষ্ট আসন দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। এঁদের ছাড়াও, আরও অনেক স্বনামধন্য কবির পদচারণায় গৌরবান্বিত হয়েছিল টাঙ্গাইল জেলা-অঞ্চল। আঠারো শতকের কবি কেবলকৃষ্ণ বসু 'স্কন্দপুরাণ'-এর কাশীখণ্ড অনুবাদ করে রচনা করেন 'কাশীখণ্ড কাব্য'। তাঁর অপর কাব্য 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'— হিন্দু ও মুসলিম সমাজের মিশ্রদেবতা সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের অলৌকিক শক্তিমাহাত্ম্যবর্ণনাবিষয়ক কাব্য। এ-শতকেরই কবি আরাধন বাগচী ওই একই বিষয় নিয়ে রচনা করেন 'সত্যমঙ্গল' বা 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী' নামে অপর এক গ্রন্থ। আঠারো শতকের শেষভাগে কবি ত্রিলোচন চক্রবর্তী সংস্কৃত কবি ব্যাসদেবের মহাভারতে উল্লিখিত কুরু পাণ্ডবদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ-কাহিনীকে অবলম্বন করে রচনা করেন 'ভারত-পাঁচালী' কাব্য। এ-শতকেরই আর এক বিখ্যাত কবি শ্যামচাঁদ গুপ্ত। বিল-ঝিল নদী-নালা বিধৌত, বিশেষত বর্ষাকালে জলপ্লাবিত এ-অঞ্চলের মানুষের শ্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত সঙ্গীত 'সারিগান'-এর রচয়িতা তিনি। তাঁর এ গানগুলো পরবর্তী সময়ে সংকলিত হয়েছে তাঁর 'সারিগান'-নামের গ্রন্থে। টাঙ্গাইলের আর এক প্রাচীন কবি মুক্তারাম নাগ, 'দুর্গামঙ্গল'- কাব্যের রচয়িতা। এছাড়াও ষোল শতকে আবির্ভূত মুকুন্দ ভারতী নামের অন্য এক কবির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক কাহিনী অবলম্বনে রচনা করেন 'জগন্নাথ বিজয়'-কাব্য। মধ্যযুগীয় এসব কবিদের মধ্য থেকে কালক্রমে অনেকেই বিস্মৃতির অতল তলে হারিয়ে গেছেন, অনেকে হারাতে বসেছেন। তাঁদের রচনাকর্মের সংগ্রহ ও যথাযথ সংরক্ষণ এবং সাহিত্য সমাজে এসবের পরিচায়নের যথার্থ উদ্যোগের অভাব ও অনীহাই এর অন্যতম প্রধান কারণ।

শুধু লিখিত সাহিত্যই নয়, লোকসাহিত্যের অসংখ্য ধারায়ও পূর্ণ এ-জেলার সাহিত্যভাণ্ডার। গ্রামীণ নিরক্ষর ও অর্ধশিক্ষিত সমষ্টিমনের সৃষ্টি 'ছড়া'; দীর্ঘ জীবনাভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি 'প্রবাদ'; 'গীতিকা', 'রূপকথা', 'লোককাহিনী'; ধর্মীয়, ও ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়, ইতিহাস ও দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাকেন্দ্রিক একক বিষয়নির্ভর বা প্রশ্নোত্তরমূলক 'ধুয়াগান'; বিলঝিল-নদনদীবহুল এবং বর্ষাকালে জলপ্লাবিত এ-অঞ্চলে নৌকাচালনা বা নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দীপনাবর্ধক সঙ্গীত 'সারিগান'; ভাটিস্রোতে নৌকাচালনার সময়ে শান্ত-সৌম্য প্রকৃতির প্রভাবে জাগ্রত নিঃসঙ্গতা ও ঔদাসীন্যের সূত্রে সৃষ্ট 'ভাটিয়ালী'; যুক্তিমুখ্য তর্কবির্তকের মাধ্যমে অগ্রসরমান একটি নির্বাচিত বিষয়কেন্দ্রিক (প্রেমতত্ত্ব-ধর্মতত্ত্ব-দেহতত্ত্ব-ইতিহাসবিষয়ক) 'কবিগান'; পূর্ব মৈমনসিংহ গীতিকার কাহিনীভিত্তিক বেহুলা-লখীন্দর, নিমাই-সন্ন্যাসী, ঐতিহাসিক

বা সমসময়ের বিভিন্ন ঘটনা বা বিষয়, মূলত কারবালাযুদ্ধের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী ও করুণরসাত্মক পরিণতিভিত্তিক 'জারী গান'; সময়ের (দিন-মাস) পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে, মূলত নারী জীবনের বিরহ-মিলন আশা-আকাঙ্ক্ষা বেদনা-জর্জরিত জীবনভিত্তিক সঙ্গীত 'বারমাসী গান'; প্রেমিক-প্রেমিকার (মূলত স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির) মনোগত বিচ্ছেদ-ভাবনা বিষয়ক 'বিচ্ছেদী'; এবং অধ্যাত্ম বা অতীন্দ্রিয় ভাবনাজাত 'মরমী সঙ্গীত' (মারফতী, মুর্শিদী, বাউল) ইত্যাদির সমৃদ্ধ ভাণ্ডার ছিল এ-জেলা অঞ্চল। এগুলোর প্রবহমান ধারা বর্তমানকালকে স্পর্শ করতে পেরেছে। উল্লেখ্য: চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত এবং দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'পূর্ব মৈমনসিংহ গীতিকা'য় সঙ্কলিত গীতিকাগুলো যে এককভাবে শুধু ময়মনসিংহেরই সম্পদ বা গৌরবের বিষয়, তা নয়। বৃহত্তর ময়মনসিংহের আওতাভুক্তঅঞ্চল হিসেবে একসময় টাঙ্গাইল জেলা-অঞ্চলেও এসবের প্রচলন ও প্রবহমানতা লক্ষ করা গেছে। অর্থাৎ পূর্ব ময়মনসিংহ হতে সংগৃহীত হলেও, এসবের অনেকগুলোই টাঙ্গাইল-অঞ্চলে প্রচলিত ছিল এবং বর্তমানেও এ-জেলার কোনো কোনো অঞ্চলে এসব গীতিকার প্রচলন লক্ষ করা যায়। এমনকি 'পূর্ব মৈমনসিংহ গীতিকা'র কাহিনীগুলো 'জারীগান'-রূপে পূর্বকালে এবং বর্তমান সময়েও এ-এলাকায় প্রচলিত। যেহেতু একথা প্রমাণিত সত্য যে ময়মনসিংহ-অঞ্চলের লোকসাহিত্যের ভিত্তিভূমি ইন্দো-মঙ্গোলীয় জাতির সংস্কৃতি। বর্তমানে এ-অঞ্চলে বসবাসরত বিভিন্ন 'উপজাতি' এই ইন্দো-মঙ্গোলীয় জাতিরই উত্তরপুরুষ। তাই 'ময়মনসিংহের লোক-গীতির যে ঔপজাতিক সংস্কৃতি রয়েছে—টাঙ্গাইলের লোকসাহিত্যের উৎস-মূলের সঙ্গেও সে সংস্কৃতির একটা যোগসূত্র আছে'।[১২] অন্যদিকে, দক্ষিণারঞ্জনমিত্র মজুমদারের বিখ্যাত 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠানদিদির থলে', 'দাদা মশায়ের থলে', 'ঠাকুর দাদার ঝুলি' ইত্যাদি গ্রন্থে সঙ্কলিত রূপকথার অনেকগুলোই বর্তমানেও টাঙ্গাইল-অঞ্চলে প্রচলিত। এ তথ্য অমূলক নয় যে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র তাঁর মামার বাড়ি টাঙ্গাইলের মধুপুর-অঞ্চলে অবস্থানকালে এসব রূপকাহিনীর সংস্পর্শে আসেন।[১২ক] সুতরাং লোকসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ *'পূর্ব মৈমনসিংহ গীতিকা'* এবং *'ঠাকুরমার ঝুলি'* ও অন্যান্য গ্রন্থ—টাঙ্গাইলের লোকসাহিত্যের উপাদান আত্মস্থ করেছে, এ-মন্তব্য করা যায়। তবে 'টাঙ্গাইলের দুর্ভাগ্য যে এইস্থানে কোন লালবিহারী দে, চন্দ্রকুমার দে, দীনেশচন্দ্র সেন, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, অথবা অন্তত একজন মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, জসীম উদ্‌দীন বা আব্বাসউদ্দীনের সংগ্রহ-ক্ষেত্র হয়নি। তাহলে সংগৃহীত লোকসাহিত্য-সম্ভার টাঙ্গাইলকে বিশ্বসভায় আরও সুপরিচিত করে তুলতে পারতো—সম্পদে, সৌন্দর্যে এবং সুরকলায়।'[১৩]

এছাড়া, বহুল প্রচলিত ছন্দে ও সহজ-সরল ভাষায় রচিত নবী-রসুল, পীর-দরবেশ-বীরযোদ্ধা, প্রেমিক-প্রেমিকার কাহিনীভিত্তিক পুথি-সাহিত্য অনেক আগে

থেকেই এ-জেলার মানুষের মধ্যে সামাজিক জীবনের দায়িত্ব-কর্তব্য, ধর্মীয় উপদেশ, নীতিকথা ইত্যাদি শিক্ষায় অবদান রেখে আসছে। এ-অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয়েছে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনেক পুথি। সাহিত্যিক রসিকচন্দ্র বসু (১৮৭২-১৯২২ খ্রি:) টাঙ্গাইলের বিভিন্ন এলাকা থেকে বৈষ্ণব সাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, ইসলামী সাহিত্য (বাল্‌কা নামা)— ইত্যাদি বিভিন্ন ধারার অনেক পুথি সংগ্রহ করেন। যার কিছু অংশ বর্তমানে করটিয়ার সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের গ্রন্থাগারের পুথিশালায় সংরক্ষিত রয়েছে। এর মধ্যে একটি পুথি রামনাথ সেনের 'কালিকাপুরাণ'- কাব্যগ্রন্থের; এটি টাঙ্গাইলের বাশাইল থানার বাশাইল গ্রামের শ্রীমদনমোহন গুহ কর্তৃক ১২৩৯ বঙ্গাব্দে (১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে) অনুলিখিত হয়েছিল।[১৪] সন্তোষের জমিদার বাড়িতে মনসামঙ্গল, রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণব সাহিত্য, পুথি-পাঁচালী'-র প্রচুর সংখ্যক পুথি সংরক্ষিত ছিল। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকবাহিনী সেই 'বিশাল সংগ্রহ'-এর বিনষ্টি সাধন করে। ওই সময়ে সেসব পুথির কিয়দংশ মওলানা ভাসানীর ব্যক্তিগত জনৈক কার্যনির্বাহক[১৪ক] কর্তৃক সংগৃহীত হয়। সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের[১৪খ] অন্তর্ভুক্ত কলেজের জনৈক প্রাক্তন অধ্যাপিকা[১৪গ] কাছে এর কিছু পুথি এখনও সংরক্ষিত আছে। তন্মধ্যে একটি পুথি কবি নারায়ণদেবের 'পদ্মাপুরাণ'- কাব্যের; এটি টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ী বাজারে ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে অনুলিখিত হয়েছিল। ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া টাঙ্গাইল-অঞ্চল থেকে কবি নারায়ণদেবের 'পদ্মাপুরাণ'-কাব্যের একটি খণ্ডিত পুথি সংগ্রহ করেন। ওই পুথিটি টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ী বাজারের নিকটবর্তী ইন্দ্রবেলতা গ্রামনিবাসী শ্রীঈশানচন্দ্র চাকী কর্তৃক ১৩০২ বঙ্গাব্দে (১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে) অনুলিখিত হয়েছিল। বর্তমানে পুথিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথিশালায় সংরক্ষিত আছে। তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত কবি নারায়ণদেবের 'পদ্মাপুরাণ'-গ্রন্থের সম্পাদনা কার্যে ব্যবহারের জন্য কিছু পুথি সংগৃহীত হয়েছিল টাঙ্গাইলের ঘাটাইল এলাকা থেকে। পরবর্তী সময়ে তিনি এসব পুথি ব্যবহার করে গ্রন্থটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথিশালার ২৭৯৯ -সংখ্যক পুথি (নারায়ণদেবের 'পদ্মাপুরাণ'-গ্রন্থের) ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে আধুনিক টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানার ভাড়রা গ্রামে অনুলিখিত হয়েছিল। চিত্রযুক্ত এ-পুথিটিতে বহুবর্ণে রঞ্জিত ঊনচল্লিশটি ছবি রয়েছে। প্রাচীন পুথি বিষয়ক উপর্যুক্ত তথ্যাদির আলোকে বলা যায়, টাঙ্গাইল-অঞ্চল থেকে সংগৃহীত বা টাঙ্গাইল- অঞ্চলে লিপীকৃত প্রাচীন সাহিত্যের অনেক পুথি আজও এ-জেলাবাসী মানুষের ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকাটা অস্বাভাবিক নয়।

বর্তমান প্রবন্ধে আঠারো শতক পর্যন্ত সময়ের টাঙ্গাইলের প্রাচীন কবিদের সম্পর্কেই মূলত আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম—কবি শ্রীরামলোচন

দাস। মধ্যযুগের শেষপ্রান্তে জন্মগ্রহণকারী এই কবির গ্রন্থসমূহ উনিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে রচিত হলেও, গ্রন্থের বিষয়-বক্তব্য-রচনারীতি একান্তভাবেই মধ্যযুগীয় ছাঁচে গড়া। বিষয় ও রচনারীতি বিবেচনায় তাঁকে মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্যের সীমানা থেকে কোনোভাবেই আলাদা করা যায় না। এ পর্যায়ে আরও উল্লেখ্য যে আলোচ্য নিবন্ধে উপস্থাপিত কবিদের কারো কারো সম্বন্ধে (বিশেষত তাঁদের জন্ম ও কর্মস্থান সম্পর্কে) সমালোচকদের মধ্যে ভিন্নমত প্রচলিত রয়েছে। তবে পর্যালোচনার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত এসব মতানৈক্যের নিরসন হয়। তখন এসব কবিদের নিশ্চিতরূপে টাঙ্গাইলবাসী কবি হিসেবে নির্ধারণ করা যায়।

পরিশেষে, এ-প্রবন্ধে মূলত স্থান পেয়েছে টাঙ্গাইলের পাঁচজন প্রাচীন কবি-সম্পর্কিত বিশদ আলোচনা; যাঁদের রচিত গ্রন্থ পরবর্তী সময়ে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়েছে কিংবা 'সংগৃহীত পুথি'- পাঠের মাধ্যমে যাঁদের জীবন ও সাহিত্য কর্ম-সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়েছে। এঁরা হলেন :

১. শ্রীরায় বিনোদ
২. কবি মাধবাচার্য
৩. ভবানীপ্রসাদ রায়
৪. রূপনারায়ণ ঘোষ
৫. শ্রীরামলোচন দাস

এছাড়া টাঙ্গাইলবাসী প্রাচীন যেসব কবির জীবন ও রচনাকর্ম সম্পর্কে অসম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তাঁদের সম্পর্কেও পরিশেষে 'অন্যান্য কবি'-অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

দুই : শ্রীরায় বিনোদ

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কাব্যধারা মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যের প্রাচীনতর ও গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা মনসামঙ্গল; খ্রিষ্টীয় পনেরো শতক থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত যার বিস্তৃতি। এই মনসামঙ্গল কাব্যের এক বিখ্যাত কবি শ্রীরায় বিনোদ; খ্রিষ্টীয় ষোল শতকে যিনি সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত মনসাবিষয়ক কাব্য 'পদ্মাপুরাণ' সর্পদেবী মনসার স্তুতিমূলক মঙ্গলকাব্য। 'পদ্মাপুরাণ'-কাব্যের 'আত্মপরিচিতি ও গ্রন্থোৎপত্তি'-অংশে উল্লিখিত তথ্যের সূত্র ধরে কবির ব্যক্তিগত পরিচয় জানা যায়। কবি ছিলেন তৎকালীন 'বঙ্গদেশ'-এর আটিয়ার অন্তর্গত 'ধোবড়িয়া', (আধুনিক টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানার 'ধুবড়িয়া')- গ্রামের অধিবাসী।

বঙ্গদেশে আটিয়া কেবল ভোগস্থল।
ধোঁবড়িয়া নামে গ্রাম অতি মনোহর ।। (পৃ. ৫)

কবির পিতার নাম শতানন্দ রায়, পিতামহের নাম কমলাক্ষ সেন। পিতা 'ধর্মরায়-উপাধি লাভ করলে পিতামহের বংশগত উপাধি 'সেন'-এর অবলুপ্তি ঘটে। এরপর থেকে পরবর্তী প্রজন্মধারায় 'রায়' উপাধিই ব্যবহৃত হতে থাকে। কবি শ্রীরায় বিনোদও 'রায়'-উপাধি গ্রহণ করেন। কবির আসল নাম 'শ্রীরাম'। কিন্তু শ্রীরায় বিনোদ হিসেবেই ছিল তাঁর সমধিক পরিচিতি। কবির সমসময়ে ব্রহ্মপুত্রের মুখ্যধারা (=প্রধান শাখা নদী) লোহজঙ্গ নদীবিধৌত ধোবড়িয়া ছিল 'ব্রাহ্মণ সজ্জন বৈশ্য পণ্ডিত ব্রহ্মচারী'র বাসস্থান। ধর্মে-কর্মে নিবিষ্ট, দয়াশীল, সত্যবাদী ও বিবিধ গুণসম্পন্ন ছিলেন গ্রামের অধিবাসিগণ।

ব্রাহ্মণ সজ্জন বৈশ্য পণ্ডিত ব্রহ্মচারী।
সদাচার পুণ্যরত পবিত্র গুণশালী ।।
ভাগবতপুরাণ সভে করএ শ্রবণ।
কৃষ্ণভক্তি বিনা কার অন্য নাহি মন।।
পুণ্যবন্ত সর্বলোক বিষ্ণুভক্তি মন।
অধিকারী রায় কেবল পুণ্যজন।।
বিষ্ণুভক্তি শুদ্ধমতি পূজেন ব্রাহ্মণ।
রামকৃষ্ণ নাম বহি নাহি অন্য মন।।
জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী গুণের নিধান।
দানধর্ম দয়াশীল অতি পুণ্যবান্।। (পৃ. ৫-৬)

উল্লেখ্য : আধুনিক টাঙ্গাইল জেলা-শহরের পাশ দিয়ে যে লোহজঙ্গ (অর্থাৎ 'লৌহজং') নদী প্রবাহিত, তা কবি শ্রীরায় বিনোদ বর্ণিত লোহজঙ্গ নয়। কেননা, কবিবর্ণিত লোহজঙ্গ নদীটির উৎপত্তি পুরোনো 'ব্রহ্মপুত্র' থেকে। কিন্তু বর্তমানের লোহজঙ্গের উৎপত্তি 'যমুনা' থেকে। এ যমুনার উৎপত্তি ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে। তারও আগে, রেনেলের মানচিত্র (১৭৭৬ খ্রি:)-এ লোহজঙ্গ নদীটি ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী হিসেবেই উল্লিখিত। সুতরাং কবির কাব্যে বর্ণিত লোহজঙ্গ নদীটি যমুনার উৎপত্তি লাভের পূর্বেকার ব্রহ্মপুত্রেরই শাখা নদী।[১৫] আর হিন্দুজনগোষ্ঠী প্রধান ধোবড়িয়ায় 'রায়'-এরাই ছিলেন বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। কবির পিতা শতানন্দ রায়েরও চাল-চলন ছিল রাজার মতো। যেহেতু সামন্ত প্রথার সেই যুগে শতানন্দ রায় ছিলেন প্রায়-স্বাধীন একজন ভূস্বামী। স্মর্তব্য যে মধ্যযুগীয় সামন্ত সমাজব্যবস্থায় প্রায়-স্বাধীন ভূস্বামীরাই ছিলেন শাস্ত্রচর্চা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। কবি শ্রীরায় বিনোদের পারিবারিক ঐতিহ্যেও এর ব্যতিক্রম

পরিলক্ষিত হয় নি। এ-কারণে স্বাভাবিকভাবেই শ্রীরায় বিনোদের মনোজগতে পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রভাব পড়েছিল ব্যাপকভাবে।

মধ্যযুগীয় রচনাপ্রথা অনুযায়ী কবিগণ তাঁদের রচনায় হেঁয়ালিমূলক শ্লোকের মাধ্যমে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরাসরি কবি ও কাব্য সম্পর্কিত নানা কালিক তথ্য উপস্থাপন করতেন। উল্লেখ করতেন শাসক কিংবা পৃষ্ঠপোষকের নাম। যা কবির আবির্ভাবকাল এবং কাব্যের রচনাকাল শনাক্তকরণে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করতো। কিন্তু শ্রীরায় বিনোদ তাঁর কাব্যে এ-ধরনের কোনো তথ্য উপস্থাপন করেননি, কেবল স্বগ্রামের বর্ণনা প্রসঙ্গে দু'টি স্থাননাম এবং একটি নদীনামের উল্লেখ ছাড়া। কাব্যে উল্লিখিত কবির স্বগ্রামের বর্ণনা,* পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঐতিহাসিক সত্যতা, কবির মনোদর্শনে ধর্মীয় প্রভাব, ইতিহাস ও কাব্যের ভাষা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে কবি ষোল শতকেই এ-কাব্য রচনা করেন। এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সহায়ক ধুবড়িয়া গ্রামের ইতিহাস সম্বন্ধে কবির গ্রামবাসী মুহম্মদ সিদ্দিক খান রচিত A study in Mughal Land Revenue system প্রবন্ধটি।[১৫ক] এ-প্রবন্ধে উল্লেখ রয়েছে যে মুঘল সম্রাট শাহজাহান ১৬৩১ খ্রিষ্টাব্দে শাহী ফরমান বলে মদদ-ই-মাআশ হিসেবে ধোবড়িয়া মৌজা নয়জন মুসলিমকে দান করেন। সেই সময় থেকে ফরমান বলে প্রাপ্ত উল্লিখিত ব্যক্তিগণ এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্ম উত্তরাধিকারসূত্রে এ-ভূসম্পত্তির অধিকারী। আর বর্তমান কাল পর্যন্তও গ্রামের অধিবাসীরা মুখ্যত মুসলমান। সুতরাং কবির কাব্যের 'পুণ্যবন্ত সর্বলোক বিষ্ণুভক্তি মন। অধিকারী রায় কেবল পুণ্যজন।।'— অধ্যুষিত হিন্দুসভ্যতাসমৃদ্ধ ও হিন্দু প্রধান ধোবড়িয়ার যে-পরিচিতি, তা যে ১৬৩১ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেকার, তা বলাই বাহুল্য। এ-প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য যে বঙ্গদেশের 'আটিয়া' প্রাচীনকাল থেকেই প্রসিদ্ধ স্থান হিসেবে পরিচিত, যা ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই মুঘল অধিকারে চলে যায়। তখন থেকেই অভিজাত হিন্দু-ভূস্বামীদের আভিজাত্য ও ঐশ্বর্যের ঘাটতি প্রকট হতে থাকে। তাই বলা যায়, এ-অঞ্চলে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে, ধোবড়িয়া যখন ছিল শ্রীরায় বিনোদের পারিবারিক প্রতিপত্তি-ক্ষমতা-ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ, তখনই কবির এ-কাব্য রচিত। সুতরাং কবির আবির্ভাবকাল উপর্যুক্ত সময়ের পূর্বে। তাই স্বাভাবিকভাবেই কবি চিহ্নিত হন ষোল শতকের কবি হিসেবে।

জমিদারপুত্র হয়েও কবি শ্রীরায় বিনোদ ছিলেন গায়েন। তিনি গান করতেন আসরে। কাব্যের 'আত্মপরিচিতি ও গ্রন্থোৎপত্তি', 'দেবতাস্তুতি', 'পদ্মার বরপ্রার্থনা'-অংশে উল্লিখিত উদ্ধৃতি বিশ্লেষণে কবির গায়েনসুলভ পরিচিতির প্রমাণ মেলে।

মনসাপাঁচালী রচনায় শঙ্কর-কুমারী (=মনসা)-র স্বপ্নাদেশ ও এ- বিষয়ে কবিকে সহায়তা প্রদানে দেবীর আশ্বাসবাণী স্মর্তব্য :

আমার মাহিত্য জেন গাএ সর্বজন।
রচহ পাঁচালী তুমি পুরাণ কথন ।।
মুঞি আজ্ঞা কৈলুঁ তোরে সদয় হইয়া।
শুদ্ধপদ বুলিব আমি তোর কণ্ঠে রৈয়া।।
শুনিয়া সানন্দ জেন হএ সর্বজন।
রচহ পাঁচালী তুমি পুরাণ কথন।। (পৃ. ৬)

তাছাড়া কবির কাব্যগ্রন্থটি যে আসরে গাইবার উদ্দেশ্যেই রচিত তা-ও কাব্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর উল্লেখ থেকেই বোঝা যায়। শাস্ত্রকথা-সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিন্দুভূস্বামীপ্রভাবিত সেই সামন্তপ্রথার যুগে তাঁর 'গায়েন'-পরিচিতি নিঃসন্দেহে গৌরবের বিষয় ছিল।

কবি ছিলেন বৈষ্ণব। তাঁর বিষ্ণুভক্তি শুধু কাব্যের 'দেবতাস্তুতি' কিংবা 'আত্মপরিচিতি ও গ্রন্থোৎপত্তি'-অংশেই বিধৃত নয়, কাব্যের বিভিন্ন অংশে তাঁর বিষ্ণুভক্ত মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে। কবি কেবল নিজেই 'বিষ্ণুভক্তি শুদ্ধমতি নন'; 'রায়'- পরিবারের সকল সদস্যই বিষ্ণুবন্দনায় নিবেদিতপ্রাণ। এমনকি কবির গ্রামবাসীরাও বিষ্ণুভক্ত। তাই :

ভাগবত পুরাণ সভে করএ শ্রবণ।
কৃষ্ণভক্তি বিনা কার অন্য নাহি মন।।
... ...
বিষ্ণুভক্তি শুদ্ধমতি পূজেন ব্রাহ্মণ।
রাম কৃষ্ণ নাম বহি নাহি অন্য মন।। (পৃ. ৬)

ধুবড়িয়া গ্রামে কবির পূর্বপুরুষদের বসতিস্থাপনের প্রাচীনতা সম্বন্ধে কোনো তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে কাব্যের বর্ণনা অনুসারে একথা সুস্পষ্ট যে তিনপুরুষ ধরে ধুবড়িয়া গ্রামেই কবির বংশধরদের বসবাস। উল্লেখ্য : পুরানো লোহজঙ্গ নদীর মরাখাতসংলগ্ন কবি শ্রীরায় বিনোদের ধুবড়িয়াস্থ বাস্তুভিটার চিহ্ন আজও বর্তমান। (এ বাস্তুভিটাতেই ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়)।

মনসা-চাঁদ সওদাগর-বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরকে নিয়ে রচিত মনসামঙ্গল বা 'পদ্মাপুরাণ'-কাব্যের রচয়িতা মধ্যযুগের বহু কবি। শ্রীরায় বিনোদ এ-ধারার অন্যতম প্রাচীন কবি। ধর্মবিধি ও শাস্ত্রানুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সে যুগের

জীবনধারায় বিষয়বস্তুর গতানুগতিকতার মধ্যেও, আপন শিল্পনৈপুণ্যে বাস্তব জীবনকে কাব্যবিষয়ের সঙ্গে সমন্বিত করতে পেরেছিলেন মনসামঙ্গলের কবিরাই। মধ্যযুগীয় অলৌকিকতার প্রাবল্যেও তাঁদের রচনায় দেবতা নয়, মানব চরিত্রই উজ্জ্বল। এ-মনসামঙ্গল ধারারই ব্যাপক প্রভাব ও বিস্তৃতি ঘটেছিল পূর্ববাংলায়। অপেক্ষাকৃত নীচু এলাকা বলে বর্ষাকালে জলপ্লাবিত বিস্তৃত এলাকা ছেড়ে এখানে সাপ আশ্রয় নিতো বাড়ি-ঘরে ও ঝোপে-ঝাড়ে। সাপের ভয়ে তখন এখানকার মানুষ সর্বদা ভীতসন্ত্রস্ত থাকতো। ভৌগোলিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই এ-উপদ্রব থেকে নিস্তারলাভের প্রত্যাশায় এ-অঞ্চলের মানুষ আশ্রয় প্রার্থনা করতো সর্পদেবী মনসার কাছে। আর এ-কারণেই এ-অঞ্চলে মনসাপূজার ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। সঙ্গত কারণেই বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের মধ্যে এ-অঞ্চলে মনসামঙ্গলই সবচেয়ে বেশি প্রচার ও প্রসার লাভ করেছিল। আর একথা বলা যায়, পূর্ববঙ্গের কবিদের রচিত মঙ্গলকাব্যের মধ্যে প্রধানই ছিল মনসামঙ্গল বা 'পদ্মাপুরাণ'- কাব্য।

গতানুগতিক কাহিনীকে কাব্যের বিষয় করেও কবি শ্রীরায় বিনোদ আপন শিল্পচাতুর্যে মৌলিকত্বের দাবিদার। মানুষের আত্মশক্তি, মানবিকতা, মনুষ্যত্ববোধ, অপরাজেয় সক্রিয়তার প্রতি কবি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। মানুষের প্রতি তাঁর আস্থার নিঃসন্দেহ প্রমাণ তাঁর 'চান্দো সদ্বাগর'। কাব্যের শেষ-অংশে তাই তাঁর চান্দো পুত্রবধূ বিপুলার সতীত্বপরীক্ষার প্রশ্নে বিরুদ্ধ-মনোভাব পোষণ করে। মানব চরিত্রের মাহাত্ম্য সম্পর্কে চান্দো সচেতন। জীবন-যুদ্ধে সদা সংগ্রামী চান্দো নিজ জীবনের অপরাজেয় অভিজ্ঞতার আলোকে মূল্যায়ন করে পুত্রবধূ বিপুলাকে। তাই নিষ্ক্রিয় চরিত্র লক্ষ্মীন্দর বিপুলা সম্পর্কে যে-প্রস্তাব সহজেই উত্থাপন করতে পারে, আত্মশক্তিতে বলিয়ান ও সংগ্রামী চান্দো তা সমর্থন করতে পারে না।

লক্ষ্মীন্দর বোলে বাপ তোমাক কহি বাণী।
একসরী ভাসিল সাহের নন্দিনী।।
বণিক উত্তমকুল জ্ঞাতি ভয় করি।
বিনা পরীক্ষায় বিপুলারে ঘরে নিতে নারি।।
চান্দো বোলে শুন পুত্র চন্দ্রবদন।
হেন ছার কথা বাপ কহ কি কারণ।।
সতী-পতিব্রতা বড় সাহের কুমারী।
বধূর পরীক্ষা আমি লইতে না পারি।। (পৃ. ৩৫৪)

নিজস্ব যুক্তির নিরিখে মানব-চরিত্রের এই অন্তর্নিহিত সত্যটি কবি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সূক্ষ্ম অথচ গভীর প্রত্যয়ে একাব্যের প্রতিটি চরিত্র উজ্জ্বল ।

কবির চান্দো সদাগর অগাধ সুখ আর ঐশ্বর্যের আশ্বাসেও নিজ দেশের কথা বিস্মৃত হয় না। সে বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করে লঙ্কারাজের বন্ধুত্বসুলভ প্রস্তাব। কেননা তার কাছে —

নিজ রাজ্য পরিবার প্রাণ সমসর ।। (পৃ.২১৯)

শুধু সুখের স্বপ্ন-রঙিন মুহূর্তেই নয়, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও চান্দো স্মরণ করে স্বদেশ ও স্বজনদের।

সোনকা সুন্দরী সনে নহিল দরশন।
আর না দেখিলুঁ গিয়া জত বন্ধুগণ।।
কি খেনে উঠিলুঁ ডিঙ্গায় বোলে সদাগর।
পুনরপি ন জাইমু চম্পকনগর।। (পৃ. ২৩০)

তবে ব্যক্তিত্বের মর্যাদারক্ষার প্রশ্নে সচেতন চান্দোর কাছে এই স্বদেশ ও স্বজনও তুচ্ছ হয়ে যায়। যাদের কারণে চান্দো অগাধ সুখ আর ঐশ্বর্যকে প্রত্যাখ্যান করতে দ্বিধা করে না কিংবা মৃত্যুর মুহূর্তেও যাদের কথা সে ভুলতে পারে না, তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আত্মসম্মান রক্ষার প্রশ্নে তারাই তুচ্ছ হয়ে যায়।

জেহি হস্তে পূজিয়াছি দেব হরগৌরী।
সেহি হস্তে তাক আমি পূজিতে না পারি।।
ধনে জনে জাএ যদি পুত্র পরিবার।
তথাপি না পারি আমি পদ্মা পূজিবার ।। (পৃ. ৩৪৯)

আত্মসচেতন এই চান্দো তার ইষ্টদেবতার আসনে অন্য কাউকে স্থান দিতে নারাজ। তাই সীমাহীন প্রতিকূলতা ও পতনের অনিবার্যতা উপলব্ধি করেও মুক্তির প্রত্যাশায় হৃদয়-উৎসারিত শ্রদ্ধা-ভক্তিতে, শ্রদ্ধা অর্জনে ব্যর্থ পদ্মাকে পূজা নিবেদনে তার অস্বীকৃতি। শেষ পর্যন্তও মানব-প্রেমিক কবি সচেতন চান্দোকে পরাজিত করেননি। তাঁর সজ্ঞান সচেতনতায় মানুষ জয়ী রয়েছে। চান্দো তার ইষ্ট দেবতার সম্মতিক্রমে এবং নির্দেশেই মনসার উদ্দেশে পূজা নিবেদন করে, আপন আন্তর প্রেরণায় নয়।

তুষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ হইলা হরগৌরী।
শিবে বোলে পূজ গিয়া মনসা কুমারী।। (পৃ. ৩৫০)

এবং, চান্দো বোলে পূজিবারে যদি বোল মোরে।
একপাত ফুল আমি দিব বাম করে ।। (পৃ.৩৪৯)

কবি শ্রীরায় বিনোদের মানবচরিত্রসম্পর্কিত জ্ঞান সূক্ষ্ম ও সুগভীর। আর তাঁর এ-ধরনের জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত চান্দোর ভাবনার জগৎ। তাই দেবতাচরিত্রের অসঙ্গতি ও অপূর্ণতাকে সে সমর্থন করে না। যিনি মানুষের সহায় ও আশ্রয়, দাতা ও ত্রাতা—তার নিজেরই শারীরিক অসঙ্গতি ও অপূর্ণতা চান্দোর মনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। তাই একচক্ষুহীন পদ্মা তার কাছে দেবতার শ্রদ্ধা লাভে ব্যর্থ হন।

এবে সে জানিলুঁ প্রিয়া নাহি তোর জ্ঞান।
কথাত শুনিছ তুমি দেবের চক্ষু কান।। (পৃ. ১৩০)

স্বামীহীন শোকাতুরা বাঙালি পুত্রবধূর আশ্রয় শ্বশুর। ছয়পুত্রের মৃত্যুর পর চান্দো তাই আপন স্নেহধারায় পুত্রবধূদের তাপিতমন সিক্ত করতে সচেষ্ট। ছয়পুত্র হারানোর বেদনা অপূরণীয়। চান্দো এ-বেদনায় জর্জরিত। তবু সীমাহীন দুঃখের মধ্যেও চান্দো নিজেকে স্থির রাখে সকলের কল্যাণচিন্তায়; এবং আপন অন্তরের স্থিরতা-দৃঢ়তা এবং স্নেহপূর্ণ আন্তর-স্পর্শে পুত্রবধূদের সান্ত্বনা প্রদানের প্রয়াস গ্রহণ করে। এর মধ্য দিয়ে বাঙালিগৃহের শ্বশুর-পুত্রবধূর শাশ্বত সম্পর্কের চিত্রও উপস্থাপিত হয়েছে।

বধূগণ সান্ত্বাই চান্দো বোলে বার বার।
শোক বাড়াইলে স্বামী না পাইবা আর।।
শ্বাশুড়ীর সঙ্গে মাও রহ গিয়া ঘরে।
স্বামী মৈল পুত্র তোমার চান্দো সদাগরে।। (পৃ. ১৬২)

'পদ্মাপুরাণ'- কাব্যে কবির আকাঙ্ক্ষিত নারীচরিত্র বিপুলা; ধৈর্যে-সহ্যে-সংকল্পে অবিচল এবং আপন অভিপ্রায় বাস্তবায়নে দৃঢ়চেতা নারী। বিপুলা যেন নারীচরিত্রের শাশ্বত মহিমা, পবিত্রতা ও অপরিমেয় শক্তির আধার। অনির্ণেয়প্রায় প্রতিকূলতা, শোক ও লোভ তাকে অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে টলাতে পারে না। বিপুলা তার চারিত্রিক পবিত্রতা ও মাহাত্ম্যে অসাধ্যসাধনে সমর্থ হবে, এ-ধারণা কবির মনে সর্বক্ষণ ক্রিয়াশীল বলেই এ-চরিত্র নির্মিতিতে কবির মাত্রাজ্ঞান কখনোই অসঙ্গতিতে পর্যবসিত হয়নি। কোনো অসঙ্গতি বিপুলাকে স্পর্শ করেনি; অন্যায় কিংবা আত্মসম্ভ্রমহানিকর কোনো কার্যে তার সম্মতি কিংবা অংশগ্রহণ কাব্যে দৃষ্ট হয় না। যদিও মনসামঙ্গলের অন্যান্য শ্রেষ্ঠকবিদের রচনায় বিপুলা তার চারিত্রিক সঙ্গতি আগাগোড়া রক্ষা করতে পারেনি; যেখানে স্বামীর পুনর্জীবন-আকাঙ্ক্ষায় বিপুলা তার সম্মানবোধ পর্যন্ত বিস্মৃত হয়েছে।[১৬] শ্রীরায় বিনোদ এ-ব্যাপারে

যেহেতু সর্বদা সচেতন, সেহেতু তাঁর বিপুলা নেতাকে তুষ্ট করার জন্য দেবতাদের কাপড় কেচে দেয় না, শিবসভায় নৃত্যে অংশ নিলেও সে শুধুই নৃত্যরতা বিপুলা নয়। সে যে স্বর্গবিদ্যাধরী ঊষা, এক মুহূর্তের জন্যও সে একথা বিস্মৃত হয় না। তাই বাঈজী-নাচ তার পক্ষে সম্ভব নয়, কিংবা যে-কোনো উপায়ে শিবকে সন্তুষ্ট করাও তার পক্ষে অসম্ভব। রুচির বিচারে এ-ধরনের উপস্থাপন-পরিকল্পনা কবির উন্নত মানসিকতার পরিচয়বহ। কবির কাব্যে বিপুলার পরিচয় অন্যান্য বিদ্যাধরীরাও জানে।

বিদ্যাধরীগণ বোলে ঊষা সুন্দরী।
নৃত্যগীতে তুষ্ট কর দেব ত্রিপুরারি।।
জীয়াইব অনিরুদ্ধ কার্য কত বড়।
বেশ করি চল জাই শিবের গোচর।।
বিদ্যাধরীগণ তবে দিয়া আভরণ।
বিপুলারে সাজাইল ত্রিলোক্য মোহন।।
ঊষা নৃত্য করিবে শিব বিদ্যমানে।
ঊষা লৈয়া বেশ করে বিদ্যাধরীগণে।। (পৃ.৩১৮)

স্বয়ং শিবও অবগত যে বিপুলা আসলে স্বর্গচ্যুত ঊষা। তাই বিপুলার নৃত্যে মুগ্ধ হয়েও শিব তার কাছে রতি প্রার্থনা করেন না। বরং—

নৃত্য দেখি তুষ্ট হর বোলে কন্যা লও বর
তোর নৃত্যে তুষ্ট হৈল আমি।
সত্য করি বোলে হর আমি তোরে দিব বর
জেহি বর বাঞ্ছা কর তুমি।। (পৃ. ৩২১)

চরিত্রের মানসিকতা ও অভিপ্রায়ের সঙ্গে কর্মতৎপরতা ও প্রতিবেশের সুসঙ্গত উপস্থাপন কবির গভীর দৃষ্টিভঙ্গি ও মানবচরিত্রসম্পর্কিত সামগ্রিক বোধেরই বহিঃপ্রকাশ। দেবতার একচ্ছত্র আধিপত্য নয়, দেবতার উপর মানুষের মাহাত্ম্য-প্রতিষ্ঠার মতো আধুনিক মনোভাবের যে পরিচয় মনসামঙ্গলের মধ্যে সুস্পষ্টতা লাভ করে, 'পদ্মাপুরাণ'-এর কবি শ্রীরায় বিনোদ তার ষোলকলা পূর্ণ করেছেন তাঁর রচনায়। আনন্দ-বেদনা, সংগ্রাম-সাধনা, ব্যর্থতা-হতাশা ও আকাঙ্ক্ষায় কাব্যের চরিত্রগুলো বাঙালি জীবন ও চরিত্রের সঙ্গে সাধর্ম্যের যোগসূত্রে সমন্বিত হয়েছে। এমন কি কবির অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যে কেবল চান্দো-সোনকা-বিপুলাই নয়, দেব-চরিত্রগুলোও দেবলোকের অধ্যাত্মচেতনায় সীমাবদ্ধ থাকেননি; বরং বাঙালির

দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন। অর্থাৎ তাঁরা রক্তমাংসের উপাদানে গঠিত হয়ে পার্থিব অনুভূতিতে ও মানবসুলভ কর্মবৈশিষ্ট্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। দেবদেবীরা আপন অভিপ্রায় ও কর্মসম্পাদনে তাই দেব-মহিমা কিংবা অলৌকিকতাকে বাদ দিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই গ্রহণ করেছেন মানবসুলভ কর্মপন্থা ও ছলা-কলা।

দেবী বোলে মহাজ্ঞান তুমি দেও মোরে।
তবে জেহি কর্ম বোল করি কুতূহলে।।
কটাক্ষ করিলা দেবী ত্রিলোক্য মোহন।
কামাতুর হৈয়া চান্দো বুলিল তখন।।
সত্য করি বুলি আমি কভু মিথ্যা নয়।
মহাজ্ঞান দিব আমি তোমারে নিশ্চয়।।
দেবী বোলে মহাজ্ঞান কহ মোর কানে।
রঙ্গরস কর্ম তবে করি তোর সনে।।
হাসি হাসি বোলে তবে রাজা চন্দ্রধর।
মহাজ্ঞান চাহ যদি চল সরোবর।।
জেহি সরোবর দিছে রাজা কুটীশ্বর।
চান্দো সনে গেলা দেবী সেহি সরোবর।।
সরোবরে স্নান তবে করি দুইজনে।
মহাজ্ঞান দিল চান্দো মনসার কানে।।
মহাজ্ঞান পাইয়া দেবী পরীক্ষে তখনে।
হস্তের কঙ্কণ ভাঙ্গি জোড়াএ আপনে।।
মহাজ্ঞান পাইয়া আনন্দিত পদ্মাবতী।
হংসরথে গেলা দেবী অলক্ষিত গতি।। (পৃ. ১৩৮)

বিখ্যাত ভূম্যধিকারী পিতার সন্তান কবির মানসিক বৃদ্ধি ঘটেছিল সামন্ত ভূস্বামীর রাজকীয় জীবনপরিবেশে—যাঁরা ছিলেন মধ্যযুগীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রধানতম ধারক ও পৃষ্ঠপোষক। এই সমাজ-প্রতিবেশ কবির প্রতিভাদীপ্ত, বুদ্ধি-প্রখর, অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ মানস গঠনে যেমন সহায়ক হয়েছিল, তেমনি রাজবংশীয় আভিজাত্যও তাঁর চিন্তাবোধে 'রাজসিক' বৈশিষ্ট্যের বীজ উপ্ত করেছিল।

স্বাভাবিকভাবেই কবির এই মানসপ্রবণতা কাব্যের বিষয়-ভাবনায় বর্তমান। তাই যেখানেই শৌখিনতা ও বিলাস-ব্যসনের বর্ণনা, সেখানেই তিনি রাজকীয় বর্ণনা-প্রাচুর্যে মনসামঙ্গলের অন্যান্য কবিদের ছাড়িয়ে যান এবং মনসামঙ্গলের ভাব, সুর, ভাষার গ্রামীণতায় নিয়ে আসেন নাগরিক জীবনের নতুনত্ব। এ-নতুনত্ব মনসামঙ্গল ধারায় অভিনব। প্রথাগত প্রয়োগ-রীতিতে অভিনবত্ব আনয়নে কবির স্বতঃস্ফূর্ততা ও সার্থকতা তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যলব্ধ বৈশিষ্ট্যের সুসঙ্গত প্রকাশ।

পাথরের স্তম্ভ আগে কোপে সারি সারি।
নিগূঢ় করিয়া দিল খিল চালে তুলি।।
লাগাএ লোহার ঝাঁপ কপাট চৌকাঠ।
করিল লবণকোঠা সুবর্ণের খাট।।
সোনা রূপা পাথর লাগাএ থরে থরে।
নানা চিত্র করিল হিঙ্গুল হরিতালে।।
চারিদিকে লাগাইল চন্দ্রকান্ত মণি।
দিবসে মোহন ঘরে হইল রজনী।। (পৃ. ২৫৬)

চরিত্রনির্মিতিতে কবি যেমন আগোগোড়া সুসঙ্গত ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন— যার ফলে চরিত্রগুলো স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পেরেছে, তেমনি পরিবেশ-সৃষ্টিতেও তিনি সার্থক। তাঁর সচেতনতায় প্রতিটি ঘটনা প্রতিবেশের সঙ্গে স্বাভাবিকতার সাযুজ্যে সমন্বিত। কাব্যের কোথাও ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থার অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় না। জীবন-জগৎ-পরিবেশ সম্পর্কে কবির গভীর পর্যবেক্ষণ ও সামগ্রিক ধারণাই এর প্রধান কারণ। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়: হরগৌরীভক্ত চান্দোর চৌদ্দডিঙ্গা ডুবাতে-যে শিব সহজেই রাজি হবেন না, কন্যা মনসা এটা জানেন। তাই এ-ব্যাপারে শিবের সম্মতিলাভের জন্য মনসা নিজের দুঃখ, লাঞ্ছনা ও ব্যর্থতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তিনি প্রথমে শিবের সন্তানবৎসল পিতৃহৃদয়কে স্নেহার্দ্র করতে সচেষ্ট হন। পিতার করুণালাভের জন্য আত্মবিসর্জনের ইচ্ছাও ব্যক্ত করেন। কন্যার অভিমান, দুঃখবোধ এবং আত্মহত্যার হুমকিতে স্বাভাবিকভাবেই পিতা-শিবের মনে স্নেহ ও দয়ার উদ্রেক হয়। সেই স্নেহ-বাৎসল্যের কাছে ভক্তের আন্তরিক নিবেদনও তুচ্ছ হতে বাধ্য। আর এমনি প্রতিবেশসৃষ্টিসাপেক্ষে মনসা ব্যক্ত করেন তাঁর অভিলাষ। যা অস্বীকার করা পিতা-শিবের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। কবি মনসাকে দিয়ে শিবের অনুকম্পা- লাভের এই পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি করে নিয়েছেন—স্বাভাবিকতাসৃষ্টির খাতিরে।

শুন শুন আরে পিতা অভিমানে তেজিব জীবন।
আঁখিজল ধারে পড়ে শিবের সাক্ষাতে বোলে
চান্দো মোরে করে অপমান।।
হেমতালের বাড়ি দিয়া মোর ঘট ভাঙ্গে গিয়া
মোরে বোলে দুরক্ষর বাণী।
মোর সঙ্গে করে বাদ মোরে জিনিবারে সাধ
গালি পাড়ে বেঙ্গখাকুয়া কানী।।
আমার মণ্ডপঘর ভাঙ্গিলেক সদাগর
লোকে শুনি উপহাস করে।
... ...
যদি মোরে থাকে দয়া দেও ডিঙ্গা ডুবাইয়া
পদ্মা বোলে ধরিয়া চরণ। (পৃ. ২২৭)

'পদ্মাপুরাণ'-কাব্যে গল্পের মূলধারার সঙ্গে বহু উপকাহিনী সংযোজন করেছেন কবি। এ সংযোজন অসঙ্গতি বা অপ্রাসঙ্গিকতাদোষে দুষ্ট নয়, কিংবা মূলধারার গতিপ্রবাহে অন্তরায় সৃষ্টি করেনি। বরং ছোট বড় নানান উপকাহিনী মূলকাহিনীর সঙ্গে মিশে গেছে সঙ্গতিপূর্ণ সাযুজ্যে। এগুলো গল্পের বক্তব্যকে সুস্পষ্টতা দানে যেমন সহায়ক হয়েছে, তেমনি মূল বিষয়কেও করেছে সুস্পষ্ট, রসাত্মক ও চিত্তগ্রাহী। উপকাহিনী সংযোজনের এই পরিকল্পনা কবি শ্রীরায় বিনোদের মৌলিক চিন্তা-উদ্ভূত পরীক্ষা। সংযোজনের সুনিপুণ সঙ্গতিতে এ-পরীক্ষায় অর্জিত হয়েছে কবির সম্পূর্ণ সাফল্য । মনসামঙ্গলের অন্যান্য কবিদের থেকে এ-স্বতন্ত্র পরিকল্পনা-রীতি ও সার্বিক সাফল্য তাঁর কাব্যের অভিনব বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। বহু গ্রন্থপাঠের অভিজ্ঞতাই কবিকে এ-পরিকল্পনাগ্রহণে আগ্রহী করে তুলেছিল।

কাব্যের রাজসিক বর্ণনায় কবির পারিবারিক ঐতিহ্য যেমন সহায়ক হয়েছে, তেমনি কাব্যে বাস্তবতাসৃষ্টির লক্ষ্যে কোনো কোনো বিষয়ের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনায়ও তাঁর বাস্তব জীবন-অভিজ্ঞতাই সহায়ক হয়েছে। কাব্যে চান্দোর 'ডিঙ্গাপত্তন'-অংশে কবির বাস্তব অভিজ্ঞতার নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যায়।

পাতিল নায়ের দাঁড়া আগা পাছা দিয়া গুড়া
দুই গলই লাগাইল তখন।

প্রমাণ করি হাতে হাতে জোখা লৈল সুতে সুতে
ডিঙ্গাখান করিল বিচক্ষণ।।
দাঁড়া কৈল পরিপাটি নায়ের কৈল তেয়টি
পাঁচট হইল তরাতরি।
শতে শতে লোক খাটে সাতট ভরিল পাটে
নওটে হইল জে পুখরি।।
আগল পাছল দিয়া পাটে ডিঙ্গা ভরিয়া
গুড়া পরাএ ডিঙ্গার উপর। (পৃ. ১৮৯)

এ-ধরনের সুদীর্ঘ বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ব্যতীত অসম্ভব। কবি তাঁর সমসময়ে স্বীয় এলাকায় ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বৃহৎ নৌকা-গঠনের পরিকল্পনা ও পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করেছেন, এ-ধারণা করা যায়। এ-ধারণার সমর্থনও মেলে। যেহেতু কয়েক'শ বৎসরের কালিক ব্যবধানে বর্তমান সময়েও কবির জন্মস্থান টাঙ্গাইল-অঞ্চলে বৃহৎ নৌকা-গঠনের যে পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, তা যেন শ্রীরায় বিনোদের বর্ণনারই অনুসৃতি। এছাড়া, ঝড়ে পতিত ও মজ্জমান চান্দো সদাগরের চৌদ্দডিঙ্গার বর্ণনা- প্রসঙ্গে যে কাব্য-চিত্রায়ণ, তাতেও বাস্তব অভিজ্ঞতার স্বাভাবিক প্রতিফলনই প্রতীয়মান হয়। লোহজঙ্গ নদীতীরবর্তী গ্রামের বাসিন্দা হিসেবে কবির বর্ষা-বন্যা-ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে ছিল নিত্যকার পরিচয়। তাই ঝড়ে পতিত নৌযাত্রীর দুর্দশার চিত্র প্রত্যক্ষ করাও কবির পক্ষে স্বাভাবিক। কবির সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গুণেই এ-কাব্যে ঝড়-ঝঞ্ঝা এবং মজ্জমান চান্দোর দুর্দশার চিত্র এতটা নিখুঁত ও জীবন্ত।

চৌদিকে মেঘের ঘটা ঠনঠনি পড়ে ঠাটা
অবিরত শিলা বরিষণ।।
প্রলয় কালের ঝড় বহে দেখি নিরন্তর
কুণ্ডলী আকৃতি বহে বাও।
জেন কুমারের চাক ডিঙ্গাগুলা ধরে পাক
দেখিয়া চমকে মোর গাও।।
দুরন্ত নদীর জল উথলএ নিরন্তর
ঢেউগুলা পর্বত প্রমাণ। (পৃ. ২২৬)

'পদ্মাপুরাণ'-কাব্যে মনসাস্তুতিবর্ণনই কবির মূল উদ্দেশ্য। তবে এ-কাব্যে কবির সচেতনতায় মানুষই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হতে পেরেছে। মানুষের প্রতি তাঁর অন্তরের গভীর ও সূক্ষ্ম সহানুভূতিই এর কারণ। তাই মনসা দেবসুলভ মাহাত্ম্যকে বিসর্জন দিয়ে নির্মম-নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী চরিত্র। আপন মনতুষ্টি ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য এমন কোনো নীচ ও ঘৃণ্য পন্থা নেই, যা তিনি অবলম্বন করেননি। শক্তি প্রয়োগ করে ভক্তকে তাঁর (মনসার) বশ্যতা মেনে নিতে বাধ্য করার মধ্যেই মনসার আনন্দ। এমনকি ভক্তের আন্তর প্রেরণায় নিবেদিত অর্ঘ্য নয়, বহিঃশক্তির নির্দেশে নিবেদিত অর্ঘ্যেই তিনি তুষ্ট। স্বার্থান্ধ এ-মনসা কবির সচেতন সৃষ্টি না হলেও, অর্থাৎ মনসাকে এভাবে নির্মাণের কোনো অভিপ্রায় কবির না থাকলেও, তাঁকে দেবমহিমায় ভাস্বর করে তুলতে লেখকের সচেতন প্রয়াসও পরিলক্ষিত হয় না। মানবপ্রেমিক কবি 'মানবতাবোধ'-এর মতো আধুনিক বোধের অধিকারী ছিলেন বলেই তাঁর বর্ণনায় মানুষের কাছে মনসা স্নেহের ও করুণার আধাররূপে বিবেচিত হতে পারেননি। এ-বিচারে চান্দো-বিপুলা-সোনকা মানুষ হয়েও তাঁকে ছাড়িয়ে গেছে। মনসামঙ্গলের অন্যান্য কবিদের রচনায় মানুষের জন্য মনসার মধ্যে করুণা আর ভালবাসা লক্ষ করা গেলেও, শ্রীরায় বিনোদের কাব্যে এ-দিকটি প্রায় অনুপস্থিত।

আধুনিক সাহিত্য-বৈশিষ্ট্য 'মানবতাবোধ'-এ অভিষিক্ত এই মধ্যযুগীয় কবি মানুষকে দৈনন্দিনজীবনে সংঘটিত মানবসুলভ ক্রিয়াকর্মের, আচার-আচরণের, বিশ্বাস-সংস্কারের সমন্বয়ে নির্মাণ করেছেন। দেবতারাও তাদের ব্যক্তিগত জীবনে কবির এ-বোধের সীমানা অতিক্রম করে বাইরে বেরোতে পারেননি। তাই দেবতাদের ব্যক্তিগত জীবনেও ব্যর্থতা-হতাশা যেমন অনিবার্য হয়ে উঠেছে, তেমনি প্রতিকূলপরিস্থিতির চাপে আত্মবিলাপে তাঁরাও হয়েছেন বেদনার্দ্র ও ম্রিয়মাণ। এ-অবস্থা বিবেচনায়, মানুষ ও দেবতার মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যের সীমারেখা টানা সম্ভব হয় না। ব্যক্তিজীবনের দুঃখে-শোকে মনসা-চণ্ডী-বিপুলা-সোনকা নিঃস্ব-বিপন্ন-বেদনার্ত শাশ্বত মানবী রূপেই ধরা দেন। বাঙালির নিত্যপরিচিত দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে চরিত্রগুলোকে সমন্বিত করেছেন বলেই এই কাব্যের বিরাট অংশ হাহাকার ও কান্নার অশ্রুধারায় সিক্ত। তাছাড়া বেদনা-জর্জরিত হৃদয়ের বিবিধ উচ্চারণের মধ্য দিয়েও কাব্যে করুণরসের প্রাধান্য অনিবার্য হয়ে উঠেছে। কবি শ্রীরায় বিনোদ তাঁর পরিচিত বাঙালি গৃহাঙ্গণের দুঃখ-কষ্টের কথা অস্বীকার না করে, তাকে স্থান করে দিয়েছেন সাহিত্যে। তাই বিপুলা-সোনকা-পদ্মা-চান্দো-শিব-চণ্ডী ও অন্যান্য প্রতিটি চরিত্র স্ব-স্ব শোকে ও দুঃখে আকুল। এদের শোক-বিহ্বল অন্তরের পরিচয় উপস্থাপনের ফলে কাব্যে করুণরসই প্রধান রস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। মানবী বিপুলার বিলাপ :

খেনে কন্যা ভূমেঁ গড়ি পাড়ে। ...
আউলাইয়া মাথার কেশ খসিল বসন-বেশ
ভাঙ্গিলেক শঙ্খ কঙ্কণ।।
ছিঁড়িল গলার হার নানা রত্ন অলঙ্কার
ছারখার এরূপ যৌবন।
কন্যা হএ চঞ্চলা না জানে করুণা কলা
কাতর হৈয়া করএ রোদন।। (পৃ. ২৯৯)

দেবী মনসার বিলাপ :

কান্দে মনসা দেবী ধুলায় লুটাইয়া।
মুঞি হওঁ অভাগিনী বড় খণ্ডকপালিনী
প্রভু জাএ আমারে তেজিয়া।।
মোর হৈবে কোন্ গতি না বঞ্চিলুঁ তিন রাতি
প্রভু লৈয়া আপনার ঘরে।
... ...
কেবা দিল ব্রহ্মশাপ তে কারণে এত তাপ
মরিব আনলে ঝাঁপ দিঁয়া।।
চিত্তে অনেক আছিল আচম্বিতে ভাঙ্গিল
নৈরাশ করিল কোন্ বিধি।
অমূল্য রতন দিয়া কেবা নিল কাড়িয়া
মনরিত হইল না সিদ্ধি।। (পৃ. ১০৩)

কাব্যে দেবতা ও মানবচরিত্র, ঘটনা ও প্রতিবেশের যে বর্ণনা উপস্থাপিত, তার মধ্য দিয়ে মধ্যযুগীয় বাঙালি জীবন-সমাজ-সংস্কৃতি ও দেশ-কালের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে আমাদের পরিচায়িত করেছেন কবি। কবির কাব্য পাঠ করে বিভিন্ন শ্রেণীর চরিত্র, চরিত্রের মানসিকতা, পারস্পরিক সম্পর্ক, সম্পর্কের টানাপোড়েন, চরিত্রের সামাজিক মর্যাদা, সমাজব্যবস্থা, আচার-সংস্কার, শিক্ষা-মূল্যবোধ, অসঙ্গতি, আকাঙ্ক্ষা-কল্পনা— এক কথায় প্রাত্যহিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বাস্তব অবস্থার সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়। আগেই উল্লেখ করেছি, কবি আসরে গান করতেন। 'পদ্মাপুরাণ'- কাব্যকে শ্রোতাসাধারণের চিত্তগ্রাহী করার লক্ষ্যেই কবি

এতে সমকালীন বাস্তব জীবনচিত্রের প্রাধান্য দিয়েছেন, আর এসব ক্ষেত্রে কবির সচেতন মানসপ্রবণতারই প্রতিফলন ঘটেছে, এরকম ধারণা পোষণ করা অযৌক্তিক নয়। এ-সূত্রেই দেবতা কিংবা মানবচরিত্রের প্রাত্যহিক কর্মে ও আচরণে সমকালের নানা তথ্য ও চিত্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্থান করে নিয়েছে। এ-বিচারে, কবির 'পদ্মাপুরাণ' মধ্যযুগের বাঙালি সমাজ-জীবনের বাস্তব দলিল। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মধ্যযুগীয় ধর্মনিয়ন্ত্রিত সমাজজীবনে মানুষের অন্তরে শুদ্ধতা ও পবিত্রতার চেতনা জাগিয়ে তুলতে ধর্মীয় রীতিনীতি ও ঐতিহ্য-পুরাণের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল সর্বজনস্বীকৃত। কবিরা তাই কাব্যে নৈতিকচেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে ধর্মের দিকেই দৃষ্টি প্রসারিত করতেন। পদ্মাপুরাণের কবিও এর ব্যতিক্রম নন। তবে তিনি কিছুটা ব্যতিক্রমী এজন্য যে বহুবিধ গ্রন্থপাঠের অভিজ্ঞতালব্ধ বৈদগ্ধ্যে, পাণ্ডিত্যে এবং মননশীল অন্তর্দৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষ তত্ত্বকথা ও আপ্তবাক্য ব্যবহারের মাধ্যমেই কবি নৈতিকচেতনা বিকাশে অবতীর্ণ হয়েছেন। প্রবলভাবে ধর্মনিয়ন্ত্রিত মধ্যযুগীয় নৈতিকচেতনায় এ-ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ নীতিকথার ব্যবহার সত্যিই বিস্ময়কর, যা কবির প্রজ্ঞাগত স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্বই চিহ্নিত করে। প্রাসঙ্গিকভাবে উদ্ধৃত :

ক. ফড়ঙ্গ হইয়া চাহ পড়িতে আগুনি।। (পৃ. ৫৯৭)

খ. ক্রোধ নাহি রহে কভো সুজনের মনে। (পৃ. ৪৮৮)

গ. ভালমন্দ বুঝি কার্যকালে।। (পৃ. ৬০)

ঘ. আপনে আপনারে সদায় বোল বড়।
এমন গুমান জার সেহি লঘু দড়।। (পৃ. ১১৬)

এ-আপ্তবাক্যগুলো জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কবির গভীর ও ব্যাপক অভিজ্ঞতালব্ধ আত্ম-উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ।

মনসামঙ্গলের কবিরা তাঁদের রচনায় ভাষা-ব্যবহারে শ্রোতাসাধারণের শ্রেণী-অবস্থানের কথা বিস্মৃত হননি। এই সচেতনতার ফলে কাব্যে ব্যবহৃত ভাষা স্বাভাবিকভাবেই সরল ও সহজবোধ্য এবং সাধারণ সমাজজীবনসম্পৃক্ত হয়েছে। কবি শ্রীরায় বিনোদের মানস ও শিল্পবৈশিষ্ট্য ভাষা-ব্যবহারের দ্বিবিধ প্রয়োগ-কৌশলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তিনি বিষয় ও পরিবেশ অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারেও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। অর্থাৎ বিষয়গত ভিন্নতায় ভাষাও তার প্রকৃতি পাল্টিয়েছে। বিষয়-ভিন্নতার সূত্র ধরে ভাষার প্রকৃতি-পরিবর্তন তাঁর কাব্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কাব্যে সাধারণ নিম্নবিত্ত-অনভিজাত শ্রেণীর কথাবার্তায়

দেশজ ও লৌকিক শব্দবহুল ভাষার ব্যবহার লক্ষণীয়। যা কাব্যের বাস্তবতা, নিপুণতা ও সৌন্দর্যের মাত্রাগত সমৃদ্ধি ঘটিয়েছে। তাই দরিদ্র মৎস্যজীবী গোদার কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয়েছে লৌকিক শব্দবহুল ভাষা।

এহি ঘাটে বড়শি বাই পাঁচ কাহন কৌড়ি পাই
ঘরে আছে সুক্তা পাতের ঝোলা।
পাঁচটি নলের ঘর গাঙ্গের পাড়ে সুন্দর
নাড়ার ছাউনি তাথে ভালা।।
খুঁইয়া ভুটি টানাইয়া লুটা-ছালা পাতিয়া
শুইয়া থাকি রাজা হেন বাসি। (পৃ. ৩০৬-০৭)

(উদ্ধৃত কবিতাংশে ব্যবহৃত দেশজ লৌকিক শব্দ : বড়শি, সুক্তা পাতা, নাড়া, খুঁইয়া, ভুটি, ছালা ইত্যাদি।) করুণরসপ্রধান এ-কাব্যে দুঃখ-শোক-বিলাপ বর্ণনায় সচেতন ভাষা-ব্যবহারে কবির কৃতিত্ব পুরোপুরি, যা সহজেই মানুষের অন্তর স্পর্শ করে। ভাবানুযায়ী ভাষা-ব্যবহারে কবির অনুভূতি-উপলব্ধির সক্রিয়তা প্রশংসনীয়। স্বামী লক্ষ্মীন্দরের শোকে বিপুলার বিলাপ এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য :

বিপুলা সুন্দরী কান্দে হইয়া আকুল।
ধরণী লোটাইয়া কান্দে আউদল চুল।।
করুণা করিয়া কান্দে বিপুলা সুন্দরী।
প্রভুর মরণে প্রাণ ধরাইতে নারি।।
উঠি বোলান দেও প্রভু প্রাণের দোসর।
অঝর নয়ানে কান্দে চক্ষুর পড়ে জল।। (পৃ. ২৯৮)

যুদ্ধ-বর্ণনায় ব্যবহৃত ভাষায় শব্দের ধ্বনি-ঝঙ্কার সহজেই উপলব্ধ হয়। এ-ভাষা যেমন জীবন্ত ও গতিশীল, তেমনি তেজোদীপ্ত। ভাষার গতিশীল প্রকৃতি পাঠক-চিত্তে সহজেই যুদ্ধের ভয়াবহতা ও যুদ্ধসম্পর্কিত শঙ্কা সৃষ্টি করে। 'যমরাজের যুদ্ধায়োজন'- প্রসঙ্গে :

মহিষ- পৃষ্ঠে যম চড়ে যমদণ্ড লৈয়া করে
সাজি চলে যুদ্ধ করিবার।
লশ্‌কর থানাদার সরদার পাটোয়ার
থরে থরে হৈল আগুসার।। ...
ঢাক ঢোল কাড়াপড়া কর্ণাল ডগর জোড়া

বিশাল দুন্দুভি বাদ্য বাজে।
যমের হাঁকার পড়ে লাখে লাখে সেনা চলে
দর্প করি জাএ যুঝিবার। ...
আর দূত বজ্রকায় লোহার সংযোগ গায়
ধনামনা চলে জমকালা।
যুদ্ধ করিবারে জাএ ধরণী না ছোঁএ পায়ে
যুঝিতে যে জাএ মঙ্গলা।। ...
যমের সাজন দেখি ভয়ে কাঁপে দুই আঁখি
শ্রীরায় বিনোদে সুরচন।। (পৃ. ১৭৬-৭৭)

সাজ-সজ্জা-বসন-রূপ বর্ণনায় ব্যবহৃত ভাষায় তৎসম শব্দের বাহুল্য লক্ষণীয়। শুধু শব্দচয়নেই সংস্কৃত ব্যাকরণের আশ্রয় গ্রহণ করেননি কবি; রূপবর্ণনায় চয়িত উপমাও সংগৃহীত হয়েছে সংস্কৃত অলঙ্কার-ভাণ্ডার থেকে। শব্দচয়ন ও ব্যবহার-চাতুর্যে রূপবর্ণনা অংশে ব্যবহৃত ভাষা সংহত ও সুনিপুণ। কাব্যে 'বিপুলার জন্ম'-অংশে বিপুলার রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে :

প্রফুল্ল কমল মুখ খঞ্জন নয়ন।
সুবর্ণের লতা জেন দৈবের গঠন।।
অধর বিম্বফল জুতি কুটিল কেশভার।
কেশরী জিনিয়া মাজা নিতম্ব বিশাল।।
খর্ব খর্ব চিত্র হস্ত অতি সুললিত।
নখাগ্রেত চন্দ্র জেন হইছে উদিত।।
নাসিক্য সুন্দর তাথে শোভে গজমুতি।
দশন পাঁতির শোভা মাণিক্যের জুতি।।
মৃদু মৃদু কথা কহে বচন মধুর।
রাজহংস গতি চলে ঝঙ্কারে নূপুর।। (পৃ. ২০০)

পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট চরিত্র, চরিত্রের দর্শন, বিশ্বাস ও আচরিত কর্মের সঙ্গে সমন্বিত বাস্তব আবহ সৃষ্টিতে কবি শ্রীরায় বিনোদের পারঙ্গমতা প্রশংসার দাবি রাখে। এর পরিচয় মেলে মুসলিম জীবনসম্পৃক্ত *হাসান-হোসেন* বিষয়ক অংশের বর্ণনায়। কবির সুগভীর জ্ঞান ও বিচক্ষণতাই তাঁর শিল্প সচেতন মানসিকতার মূল চালিকাশক্তি। মুসলিম জনজীবনসম্পৃক্ত বলেই এ-অংশে ব্যবহৃত ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের প্রাধান্য।

ক. পিরান পরিয়া মোল্লা বান্ধিল দিস্তার।
কিতাব হাতে করি চলে বনের মাঝার।। (পৃ. ১১৪)

খ. কলিমা পড়িয়া মোল্লা পীরের নাম করে।
পূজা কর বেটা তোরা বনের ভিতরে।। (পৃ. ১১৪)

গ. নমাজ করএ মোল্লা মজিদের দ্বারে।
দেওয়াল বাহিয়া মাথে ঠোক্ দিল তারে।। (পৃ. ১১৭)

ঘ. জনম মরণ জত খোদার ফরমান।
ভূত পূজে হিন্দু তার কোন্ বস্তুজ্ঞান।। (পৃ. ১২০)

ঙ. একবার পোস্ত খাইয়া ঘোড়া আন বোলে।
আদম কদম সাজে রুমাল বান্ধি শিরে।। (পৃ. ১২১)

(উদ্ধৃত চরণগুলোতে ব্যবহৃত আরবী-ফারসী শব্দ : পিরান-মোল্লা-দিস্তার-কিতাব-কলিমা।) কাব্যের বিভিন্ন অংশে উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপক প্রভৃতি অলঙ্কারসমৃদ্ধ ভাষার বহুল ব্যবহার কবির বৈদগ্ধ্য ও পাণ্ডিত্যেরই বহিঃপ্রকাশ। আর এসব অলঙ্কার চরিত্রের মানসিকতা ও শ্রেণী অবস্থানের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ বিষয় বা উপাদান চয়িত উপকরণে নির্মিত। কাব্যে এসব অলঙ্কার প্রয়োগেও কবি চরিত্র ও ঘটনার প্রকৃতি অনুযায়ী অগ্রসর হয়েছেন। তাই দরিদ্র মৎস্যজীবী গোদার বর্ণনায় দেশজ ও লৌকিক উপাদানসমৃদ্ধ ভাষা-অলঙ্কারের সমাবেশ ঘটেছে।

তালখাজুর জিনি পায়ের চারি থোড়া।
দুই পায়ের পাতা যেন দুইটি কুমড়া।।
আর অপূর্ব রূপ হের দেখ মোরে।
ডইয়া হেন ঘেচুঁগুলা প্রতি নখের গোড়ে।। (পৃ. ৩০৬)

অন্য দিকে রাজপুত্র লক্ষ্মীন্দরের বর্ণনায় স্বাভাবিকভাবেই সংস্কৃত অলঙ্কারের বাহুল্য লক্ষণীয়।

পদ্মসম হস্ত পাও সুললিত সর্বগাও
চন্দ্রমুখ কমললোচন।
কনক চম্পক জিনি অঙ্গের বরণ খানি
অপরূপ দেবের নন্দন।। ...
ভুরু যুগ জোড়পাঁতি জিনি নাসা খগপতি

অধর পল্লব জুতিকারী।।

নখ অঙ্গ সুন্দর জেন দেখি শশধর

সুন্দর সুঠাম দুই জঙ্ঘ। (পৃ. ১৯৭)

ব্যবহৃত অলঙ্কার বিষয় বা ঘটনার ধরন, ব্যাপকতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ। যুদ্ধবিষয়ক বর্ণনায় :

ধনুকে টঙ্কার দিল জেন মেঘের গর্জন।

অলক্ষিতে শর-বিষ্টি বিন্ধে নাগগণ।। (পৃ. ১২৩)

প্রকৃতপক্ষে কবির 'পদ্মাপুরাণ' দেবতার কাছে নতি স্বীকারে অস্বীকৃত মানুষের প্রতি দেবী মনসার জিঘাংসা প্রবণতা এবং মানুষ চান্দোর দেব-বিরোধিতার কাহিনী। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ব্যাপী এ-কাহিনী মহাকাব্যোচিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন; সঙ্গত কারণেই এর ভাষায় মহাকাব্যোচিত ধ্বনিগাম্ভীর্য লক্ষণীয়। অপরপক্ষে, ধ্বনি-ঝঙ্কার ও সুরলালিত্যপূর্ণ রোমান্টিক ভাষার ব্যবহারেও ছিল কবির বিস্ময়কর নৈপুণ্য, যা গীতিকাব্যোচিত বৈশিষ্ট্যই মূর্ত করে। এ দু'য়ের সমন্বয়ই শ্রীরায় বিনোদের 'পদ্মাপুরাণ'। 'পদ্মাপুরাণ'-কাব্য বিশ্লেষণসূত্রে বলা যায়, মনসামঙ্গল ধারার অন্যান্য শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে শ্রীরায় বিনোদ তাঁর বৈদগ্ধ্যে, পাণ্ডিত্যে ও শিল্প-নৈপুণ্যে অবশ্যই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। গতানুগতিক বিষয়ের মধ্যে তাঁর মৌলিকতা ও বিশিষ্টতাই এর মূলকারণ। আর মৌলিক সংযোজনের ক্ষেত্রেই কবি তাঁর স্বীয় রুচিবোধ ও ভাবনার প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। তাই কবি যেমন মনসা কাহিনীর 'গ্রাম্যসুর, গ্রাম্যভাব ও ভাষার মধ্যে' নাগরিক আভিজাত্যের ছোঁয়া দিয়েছেন, তেমনি তুলে ধরেছেন মানুষের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় ক্রিয়াশীল 'মানবতাবোধ'-এর বিশদ পরিচিতি। কবি শ্রীরায় বিনোদের কৃতিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই।

তিন : কবি মাধবাচার্য

চৈতন্যযুগে এবং চৈতন্যোত্তর যুগে সম্পূর্ণ 'ভাগবত' নয়, ভাগবতের শুধু কৃষ্ণলীলাবিষয়ক স্কন্ধগুলো বৈষ্ণব সমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করে ও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর অনুবাদক কবি মালাধর বসুর মাধ্যমে ভাগবতের বিভিন্ন স্কন্ধ অনুবাদের যে সূত্রপাত, চৈতন্যযুগে ও চৈতন্যোত্তর যুগে চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব সমাজের বিবিধ অনীহার কারণে এবং বিষয়-বোধের স্বাতন্ত্র্যের ফলে সমগ্র 'ভাগবত' ছেড়ে বৈষ্ণব সমাজের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় ভাগবতের কেবল কৃষ্ণের মাধুর্য-বর্ণনাংশে; অর্থাৎ বৃন্দাবনে 'কৃষ্ণলীলা'য়। বলা যায়, সমাজ, মানুষ ও মানুষের

মনের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অনেক কবি ভাগবতের কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাহিনীর অনুসরণে ও অনুকরণে বাংলা কাব্য রচনায় ব্রতী হন। 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-কাব্যের রচয়িতা কবি মাধবাচার্য এঁদেরই একজন।

'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' প্রায় সাড়ে চারশ বছর আগে রচিত একটি প্রাচীন গ্রন্থ।[১৭] কবি মাধবাচার্য তাঁর কাব্যে স্বীয় পরিচয় প্রদানের বিস্তৃত প্রয়াস গ্রহণ করেন নি। এটা তাঁর অবচেতন মনের ভ্রান্তি নয়। বৈষ্ণব কবি আপন পরিচয়কে খুব বড় করে দেখেন নি। আপন সুনামপ্রচারের মানসিকতাও তাঁর ছিল না। তাই তাঁর জন্ম-পরিচয়, পিতা-মাতা, জন্মস্থান ও কর্মজীবনের বিস্তারিত তথ্য বিশ্বস্ত রূপে জানা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আর এ কারণেই তাঁর পরিচয় জানার জন্য আমাদের বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। স্মর্তব্য যে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-কাব্যের কবি হিসেবে একাধিক ব্যক্তির নাম যেমন প্রচলিত রয়েছে, তেমনি তাঁদের পরিচয়-সম্বন্ধেও ভিন্ন মত প্রচলিত রয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেন 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-এর রচয়িতা হিসেবে 'মাধব মিশ্র' নামে এক কবির নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-গ্রন্থে। কিন্তু তাঁর বক্তব্য থেকে এ-বিষয়ের নিঃসন্দেহ প্রমাণ মেলে না। শ্রীচৈতন্যদেবের সমসময়ের এক কবি দৈবকীনন্দন। তাঁর বর্ণনা থেকে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-এর কবি হিসেবে কবি মাধবাচার্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মাধব আচার্য্য বন্দোঁ কবিত্ব শীতল।
যাঁহার চরিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।।[১৮]

ষোল শতকের আর এক কবি ও শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত'-এর রচয়িতা বৃন্দাবন দাস। তাঁর রচনা থেকে কবি মাধবাচার্যের কৃতিত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের ব্যাপক প্রচার ও জনপ্রিয়তার কথা জানা যায়। তিনিও তাঁর কাব্যে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-কাব্যের কবি হিসেবে মাধবাচার্যের বন্দনা করেছেন।

তবে ত বন্দনা কৈলুঁ মাধব আচার্য্য।
কৃষ্ণ গুণ বর্ণন সদাই যাঁর কার্য্য।।
যে কৃষ্ণমঙ্গল কৈল ভাগবতামৃতে।
যে গীত বিদিত হৈল সকল জগতে।।[১৯]

ড. বিমানবিহারী মজুমদার—কবি মাধবাচার্যের উল্লেখ সংবলিত বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-এর রচনাকাল ১৫৪২ খ্রিষ্টাব্দের পরে বলে উল্লেখ করেছেন।[২০] এ-সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করা যায় যে কবি মাধবাচার্য 'চৈতন্যভাগবত'-রচিত হওয়ার আগেই তাঁর কাব্য-রচনার মাধ্যমে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে এ-সত্যে উপনীত

হওয়া যায় যে শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপালাভকারী কবি মাধবাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-কাব্য ষোল শতকের রচনা। শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এ-গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। কবি মাধবাচার্য 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'- গ্রন্থটি ছাড়াও বৈষ্ণব স্মৃতিবিষয়ক আরো একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটির নাম 'প্রেমরত্নাকর'। শুধু বিভিন্ন কবি বা ঐতিহাসিক বা সমালোচকের তথ্যের বা মন্তব্যের ভিত্তিতেই নয়, কবি নিজেও তাঁর নিজের নাম 'মাধবাচার্য' বলে উল্লেখ করেছেন।

মাধব আচার্য্য বলে, শুনিলে দুরিত দহে,
পরম-মঙ্গল হরি-কথা।। (শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, পৃ. ৪৫)

অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'- কাব্যের রচয়িতা যে কবি মাধবাচার্য, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কবি মাধবাচার্য চৈতন্যদেবের কৃপা লাভ করেছিলেন। তবে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা হিসেবে আলোচ্য কবি মাধবাচার্য এবং চৈতন্য-পত্নী বিষ্ণু-প্রিয়ার ভ্রাতা মাধবাচার্যকে নিয়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত। অনেকে এ দু'জনকে এক করে ফেলেন। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বেশি সমর্থন কবি মাধবাচার্যের পক্ষেই এই কারণে যে বিষ্ণুপ্রিয়ার ভাই মাধবাচার্য যে বংশের লোক সেই বংশের গোস্বামীদেরও সমর্থন কবি মাধবাচার্যের পক্ষে। তাঁরা মনে করেন যে বিষ্ণুপ্রিয়ার ভাই মাধবাচার্য 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-এর রচয়িতা নন। "কৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতা মাধবের বংশীয় গোস্বামীগণ অদ্যাপি ময়মনসিংহ জেলায় বাস করিতেছেন। ময়মনসিংহ, ঢাকা, মালদহ প্রভৃতি জেলায় তাঁহাদের বহুসংখ্যক শিষ্য আছে। শুনিয়াছি, ইঁহারা বৃন্দাবন ধামে চূড়াধারী নামক ব্রজবাসীর কুঞ্জ ক্রয় করিয়া তথায় আপনাদের কুঞ্জ স্থাপন করেন। কোনও কারণে ময়মনসিংহ জেলার কোন অধিকারী বংশের সহিত তাঁহাদের বিবাদ হয়। অধিকারী মহাশয়গণ প্রচার করিয়া দেন যে, 'ময়মনসিংহ যশোদলের গোস্বামীগণ চূড়াধারী মাধবের বংশ সম্ভূত। তাঁহারা বৈষ্ণব সমাজ পরিত্যাজ্য। মাধবাচার্য শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচনা করেন নাই। বিষ্ণুপ্রিয়ার ভ্রাতা মাধবাচার্য্যই-কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা।"[২১] কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার বংশ- ধরেরাই যেহেতু এ-মত ব্যক্ত করেন যে তাদের বংশের মাধবাচার্য কৃষ্ণমঙ্গল এর রচয়িতা নন, সেহেতু এটা নিঃসন্দেহ প্রমাণ যে কবি মাধবাচার্যই শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-এর রচয়িতা। তৎকালীন ময়মনসিংহের বৃন্দাবনধাম ও 'যশোদল'-এর গোস্বামীরাই কবি মাধবাচার্যের বংশধর। এ-প্রসঙ্গে আরো নিশ্চিত প্রমাণ মেলে ঐতিহাসিক কেদারনাথ মজুমদারের বর্ণনায়। তিনি কবি মাধবাচার্যকে প্রাচীন ময়মনসিংহের (আধুনিক 'টাঙ্গাইল'-এর) কবি হিসেবে শনাক্ত করেছেন। তাঁর মতে "ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম এ-জেলায় (প্রাচীন ময়মনসিংহে) প্রবেশ করিয়াছিল। ভক্তপ্রধান মাধবাচার্য্য সর্ব্ব-প্রথমে এতদ্দেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন।

আটীয়ার নিবিড় অরণ্যে গুপ্তবৃন্দাবন নামক স্থান শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নামের স্মৃতি আজও বহন করিতেছে"।[২১ক] আটিয়া পরগণার গভীর অরণ্যের এই গুপ্তবৃন্দাবন, বর্তমান টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল থানার অন্তর্গত সাগরদীঘির কাছে অবস্থিত। "সাগরদীঘির দুই মাইল পূর্বে বিখ্যাত গুপ্তবৃন্দাবন। রাধা-কৃষ্ণের কাল্পনিক লীলা-অভিসার বিজড়িত মধুর এ গুপ্তবৃন্দাবন। হিন্দুদের তীর্থভূমি। প্রতিবছর চৈত্র মাসের বারুণী মুক্তি স্নানোৎসব উপলক্ষে এখানে মধুর সংকীর্তনাদিতে নিশা যাপন করে সকাল বেলায় যাত্রীরা সাগরদীঘিতে এসে মুক্তিস্নান করে। ... শতাধিক তরু-তমাল ঘেরা অপূর্ব মঞ্জুশ্রীমণ্ডিত কুঞ্জবন এই গুপ্তবৃন্দাবন"।[২২] এখানেই কবি মাধবাচার্য তাঁর আবাস স্থাপন করেন এবং 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'- কাব্য রচনা করেন। কেদারনাথ মজুমদারের বর্ণনানুসারে, মাধবাচার্য এই গুপ্তবৃন্দাবনের সংস্কার সাধন করেছিলেন, ষোল শতকের গোড়ার দিকে। এ-মন্তব্যে গুপ্তবৃন্দাবনের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমাদের মনে জাগ্রত সন্দেহ বিদূরিত হয়। এই কারণে যে মাধবাচার্য যেহেতু গুপ্তবৃন্দাবনের সংস্কারক, সুতরাং তাঁর আগমনের পূর্ব থেকেই এ-স্থানটি রাধা-কৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র রূপে স্বীকৃত। তবে একথাও স্মতর্ব্য যে কেদারনাথ মজুমদার তাঁর 'ময়মনসিংহের বিবরণ'-গ্রন্থে যে- মাধবাচার্যের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁকে তিনি 'চণ্ডী'-র রচয়িতা হিসেবে অভিহিত করেন। কিন্তু 'চণ্ডী'-রচয়িতা যে মাধবাচার্য, তাঁর গ্রন্থ পাঠ করে গ্রন্থের ভণিতা থেকে এ-প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনি আসলে টাঙ্গাইলবাসী নন, নদীয়াবাসী কবি।

পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জুন অবতার।।
প্রতাপে তপন সম বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি।
কলিযুগে তার সম রাজা নাহি ক্ষিতি।।
সেই পঞ্চগৌড় মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল।
ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল।।
সপ্তদ্বীপ মাঝারে নদীয়া এক স্থান।
ব্রাহ্ম ক্ষেত্রি বৈশ্য শূদ্র অনেক প্রধান।।
পরাশর সূত হয় মাধব তাঁর নাম।
কলিযুগে ব্যাসতুল্য গুণে অনুপাম।।

তবে ড. সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-গ্রন্থে যে মত প্রকাশ করেছেন, সে মত অনুসারে শ্রীচৈতন্যদেবের সমসময়ের এবং তাঁর সাহচর্য-

লাভকারী যে মাধবাচার্যের উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনি 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-এর রচয়িতা। সুতরাং বলা যায়, কেদারনাথ মজুমদার বর্ণিত গুপ্তবৃন্দাবনের সংস্কারক এবং এ-অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্মপ্রচারক মাধবাচার্য যে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের রচয়িতা, এ-ধারণাই সঠিক। তবে 'চণ্ডী'-র মাধবাচার্য নয়, বৈষ্ণবভক্ত মাধবাচার্যই টাঙ্গাইলের এই গভীর অরণ্যে হিন্দু তীর্থভূমির সংস্কার সাধন করেছিলেন। কেদারনাথ মজুমদার তাঁর বর্ণনায় দুই মাধবাচার্যকে এক করে ফেলেছেন।

কবির বংশপরিচয় ও কর্মময় জীবন সম্বন্ধে আর বিস্তারিত তথ্য জানা যায় না। তবে মাধবাচার্য জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। গ্রন্থে উল্লিখিত ভণিতা থেকে এতৎ বিষয়ক প্রচুর প্রমাণ উদ্ধৃত করা যায়।

ক. শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত।। (পৃ. ৯৮)

খ. দ্বিজ মাধব কহে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।। (পৃ. ৩২৫)

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচনাকালে কবির মূল অবলম্বন ছিল সংস্কৃত ভাগবত পুরাণের দশম স্কন্ধ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে কবি মাধবাচার্যের অভিন্ন অঞ্চলবাসীই হলেন ষোল শতকের কবি শ্রীরায় বিনোদ। কবির 'পদ্মাপুরাণ'-কাব্যপাঠে জানা যায়, তাঁর গ্রামবাসীরা সকলেই ছিলেন চৈতন্যপূর্ববর্তী বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী। যেহেতু তখনও চৈতন্যপ্রবর্তিত গৌড়ীয় নববৈষ্ণবধর্ম এ-অঞ্চলে ব্যাপক প্রসার লাভ করেনি। বিষ্ণুভক্ত কবি ও গ্রামবাসীরা সকলেই নিয়মিতভাবে শ্রবণ করতেন 'ভাগবতপুরাণ'।

ভাগবতপুরাণ সভে করএ শ্রবণ।
কৃষ্ণভক্তি বিনা কার অন্য নাহি মন।। (পদ্মাপুরাণ, পৃ. ৬)

তবে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-প্রণেতা ডক্টর সুকুমার সেনের মতে, "ভাগবত সহজ বই নয়, পণ্ডিতরচিত ও পণ্ডিত-পাঠ্য।"[২২ক] তাই ব্রাহ্মণ-সজ্জন পণ্ডিত-ব্রহ্মচারী অধ্যুষিত ও উন্নত সাংস্কৃতিক পরিবেশ মণ্ডিত কবির গ্রামে 'ভাগবত' ও অন্যান্য পুরাণাদির চর্চা হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। ষোল শতকেই কবি মাধবাচার্যের মাধ্যমে এ-জেলা-অঞ্চলে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় নববৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত হতে থাকে। তবে কবি সাধারণ মানুষের কাছে বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক প্রচার এবং 'পণ্ডিতবোধ্য'- ভাগবতপুরাণের মর্মকথা সহজবোধ্য করার প্রয়াসে ভাগবতের বাংলা অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ-পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি বৈষ্ণব সমাজে জনপ্রিয় 'ভাগবত'-এর কৃষ্ণলীলা বিষয়ক স্কন্ধ অনুবাদ করতে উদ্যোগী হন। এ-ধারণা অযৌক্তিক নয়। কবি তাঁর গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, শৈশব-কৈশোর, বৃন্দাবনে গোপীদের সঙ্গে রাসলীলা, পুতনাদি বধ, মথুরাগমন, কংসবধ, দ্বারকানির্মাণ, জরাসন্ধবধ, নরকবধ প্রভৃতি বর্ণনার মধ্য দিয়ে

শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যকীর্তন করেছেন। দেবদেবীবন্দনায় শুরু এ-গ্রন্থে কৃষ্ণের জন্মের প্রতিবেশ সৃষ্টির কথাও উল্লেখ করেছেন কবি। দেবকী ও বসুদেবের বিবাহ হয়। পরবর্তী সময়ে বসুদেবের ঔরসে ও দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণের জন্ম হলে অত্যাচারী রাজা কংসের ভয়ে তাঁকে জন্মের অব্যবহিত পরেই ব্রজধামে নন্দ ও তার স্ত্রী যশোদার কাছে রেখে আসা হয়। শৈশবেই কৃষ্ণ তাঁর বুদ্ধি, সৌন্দর্য ও শক্তির মাধ্যমে ব্রজবাসীর মন জয় করতে সমর্থ হন। বাল্যকালেই কৃষ্ণ রাজা কংস কর্তৃক প্রেরিত পুতনা- অশ্ব- অরিষ্ট প্রভৃতি অসুরকে বধ করেন এবং কালিয়নাগকে দমন করে কালিন্দীর জল নিরাপদ করেন। আর তাঁরই পরামর্শে গোপগণ ব্রজধাম ত্যাগ করে বৃন্দাবনে গমন করে বসতি স্থাপন করে। রাধাসহ গোপীদের সঙ্গে তাঁর ক্রীড়াদি এবং পরবর্তী সময়ে বিচ্ছেদের ঘটনাও কবির কাব্যে উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন লোকের মাধ্যমে কৃষ্ণের বিনাশসাধনে ব্যর্থ হয়ে কংস মথুরায় যজ্ঞের আয়োজন করে এবং কৃষ্ণকে সেই যজ্ঞানুষ্ঠানে নিয়ে আসার জন্য অক্রূরকে প্রেরণ করে। কৃষ্ণ অক্রূরের কাছ থেকে মথুরারাজ কংসের বীভৎস অত্যাচারের কাহিনী শ্রবণ করে কংসকে হত্যা করার জন্য ভ্রাতা বলরামকে সঙ্গে নিয়ে মথুরায় উপস্থিত হন। মথুরায় প্রবেশমাত্রই কৃষ্ণ ও বলরামকে হত্যা করার পরিকল্পনায় রাজা কংস হস্তী ও মল্লদিগকে নিয়োজিত করে। কিন্তু কৃষ্ণ ও বলরাম মল্লদিগের প্রাণবধ করে সহজেই রাজসভায় উপস্থিত হন এবং সেখানে কংস কর্তৃক আক্রান্ত হলে তাঁরা কংসকেও হত্যা করেন। উদ্ধার পায় মথুরা, মুক্তিলাভ করে বসুদেব ও দেবকী। জরাসন্ধ তার জামাতা কংসের হত্যায় ক্রোধান্বিত হয়ে মথুরা অবরোধ করে। বার বার ব্যর্থ হয়ে জরাসন্ধ অবশেষে কালযবনের সাহায্য গ্রহণ করে। কিন্তু মুচকুন্দ কর্তৃক কালযবন নিহত হলে জরাসন্ধ বন্দীত্ব বরণ করে।

বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণী কৃষ্ণপ্রেমে অনুরক্ত হয়ে তাঁকে পতিরূপে পাওয়ার অভিপ্রায়ে পত্রসহ দূত প্রেরণ করে। কৃষ্ণ এতে সম্মতি প্রদান করায় বিবিধ প্রতিকূলতা অতিক্রম করে কৃষ্ণ-রুক্মিণীর মিলন সংঘটিত হয়।

শাল্ববধ- কল্লোলবধের পর গ্রন্থে গোকুলবাসীদের প্রশংসাকীর্তন, নন্দ ঘোষের ব্রজে আগমন, দেবকীর ছয়পুত্র আনয়নের ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে। আর ধর্মপ্রাণ পঞ্চপাণ্ডবের প্রতি কৃষ্ণের অগাধ ভালবাসার কথাও বাদ দেননি কবি। যদুবংশের প্রতি ব্রহ্মশাপ এবং যদুবংশ ধ্বংস হলে কৃষ্ণ স্বধামে গমন করেন। অতঃপর বসুদেবাদির দেহত্যাগ, কৃষ্ণের দেহত্যাগের কথা, গোপসৈন্য কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের রমণী-হরণ এবং অর্জুনের ব্যর্থতা ও অন্যান্য কথাও উপস্থাপিত হয়েছে। সবশেষে কৃষ্ণের মাহাত্ম্য-কথা বর্ণনার মধ্য দিয়ে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন কবি মাধবাচার্য।

উপর্যুক্ত কাহিনী সংবলিত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-কাব্যকে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য'-গ্রন্থে 'ভাগবত'-এর দশম স্কন্ধের 'সরল ও সুন্দর বঙ্গানুবাদ'[২৩] বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যটি পাঠ করে সহজেই অনুমিত হয় যে এ-গ্রন্থ শুধু ভাগবতের বাংলা অনুবাদ নয়। গ্রন্থে কবি তাঁর প্রতিভা ও কল্পনার স্বাধীন আশ্রয় গ্রহণ করতেও কার্পণ্য করেননি। তাঁর স্বতন্ত্র উপস্থাপন- ভঙ্গির নৈপুণ্যে, ভাগবতকাহিনীভিত্তিক এ-রচনা আরো সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। সুতরাং এ-গ্রন্থ শুধু ভাগবতের অনুবাদ নয়, কাব্যের 'সর্বদেবদেবী বন্দনা'-অংশে এর সপক্ষেই কবির সমর্থন ব্যক্ত হয়েছে বলে ধারণা করা যায়।

হাম অতি আত্মঘাতী, ভুবনে তিন পাতকী,
সেহ সব সুখ অনুমোদে।।
বেদ পুরাণ সার, শ্রীভাগবত আর,
প্রেম ভকতি পরকাশে।
চৈতন্য-চরণ ধর, শিরে করি আভরণ
ভূদেব মাধব ভাষে।। (পৃ. ৪)

ভাগবতের দশম স্কন্ধের বাইরেও অন্যান্য অতিরিক্ত উপকরণ ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কবি বিভিন্ন পুরাণ ও ইতিহাসের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এ-বিষয়ে গ্রন্থমধ্যে তাঁর নিঃসঙ্কোচ সম্মতি ও স্বীকারোক্তি রয়েছে।

ক. এবে আমি রচিব রুক্মিণী স্বয়ম্বর।
মন অভিলাষে তাহা শুন সর্ব্ব নর।।
রাজ রাজ অভিষেক নাহি ভাগবতে।
বিস্তারি কহিব তাহা হরিবংশ মতে।। (পৃ. ১৭৪)

খ. পারিজাত-হরণ ঈষৎ ভাগবতে।
বিস্তারি কহিব বিষ্ণুপুরাণের মতে।। (পৃ. ২১২)

ভাগবত ব্যতীত শুধু অন্যান্য পুরাণ-ইতিহাসই নয়, দশম স্কন্ধের বাইরে ভাগবতের অন্যান্য স্কন্ধেরও সাহায্য গ্রহণ করেছেন কবি মাধবাচার্য। অর্থাৎ কবি কেবল কৃষ্ণলীলাবিষয়ক বর্ণনা সংবলিত ভাগবতের দশম স্কন্ধের অনুবাদ কিংবা পুরাণ-ইতিহাস আহৃত তথ্যের মাধ্যমেই তাঁর কাব্যের পরিসীমা চিহ্নিত করেন নি, বরং পুরাণনির্ভর মূলকাহিনীধারার সঙ্গে কবির নিজস্ব অভিজ্ঞতালব্ধ এবং পারিপার্শ্বিক সমাজজীবনে প্রচলিত গ্রাম্য কৃষ্ণ-গাথা-কাহিনীও সংযোজিত

করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি, গোপীদিগের কাত্যায়নী ব্রত এবং বস্ত্রহরণ, গোপীদিগের গৃহে গমন, গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থ মন্ত্রণা, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, রাসলীলা খণ্ড, দ্বাদশ বনবর্ণন, শ্রীকৃষ্ণের বিরহ, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে গোপীদিগের সন্তাপ, গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আগমন, শ্রীকৃষ্ণের গোপীদিগের ঘরে যেতে পরামর্শ দান ইত্যাদি পরিচ্ছেদে পুরাণকাহিনীর মধ্যেও গ্রামীণ কৃষ্ণকাহিনীর প্রভাব লক্ষণীয়। এতে বাঙালির গ্রামীণ জীবন-সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালীন সমাজজীবনে এসব কাহিনীর প্রভাব খুব বেশি পরিমাণে বিরাজমান ছিল। তাই জনপ্রিয়তা অর্জনের খাতিরেই পুরাণ-কাহিনীর মধ্যে কবি এগুলোর সুনিপুণ এবং সবিস্তার সংযোজন ঘটিয়েছেন। বাংলাদেশের সমাজ-জীবনে কৃষ্ণ-রাধাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট গ্রামীণ গাথার মধ্যে, সাধারণ মানুষের মানসিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আদিরসের প্রাধান্য ছিল বেশি। কবি সমকালীন মানুষের মনের চাহিদাকে অনেকক্ষেত্রেই অস্বীকার করতে পারেননি। তাই পুরাণনির্ভর কাহিনীর মধ্যেও পুরাণবহির্ভূত এসব গল্পকথা প্রযুক্ত হয়েছে। পুরাণ-অভিজ্ঞ কবির এ-ধরনের পন্থা অবলম্বন—জনপ্রিয়তা অর্জন এবং সাধারণ মানুষের চিত্ত আকর্ষণ—এই দ্বিবিধ কারণেই, এ-ধরনের মন্তব্য অমূলক নয়।

শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী বাংলাদেশের হিন্দুসমাজে বর্তমানেও গীত হয়ে থাকে। 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-কাব্য গীত হওয়ার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল। রচনার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'- গেয় কাব্য হিসেবে আপন জনপ্রিয়তা বজায় রাখতে পেরেছে। এ-কাব্য যে গেয় কাব্য, তা সর্বজনস্বীকৃত; যে 'গীত' যুগ যুগ ধরে এদেশের মানুষের ভক্তিপ্রবণ হৃদয়কে প্রেম-মাধুর্যে মুগ্ধ করেছে। এ-প্রসঙ্গে কবি নিজেই বলেন :

> শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-গীত মধুর সঙ্গীত।
> নাচাড়ি-শিকলি রূপে কহিব বিদিত।। (পৃ. ২)

তাই গ্রন্থরচনায় কবি বিবিধ রাগ-রাগিণীর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। রাগ- রাগিণী সম্বন্ধে কবির প্রভূত জ্ঞান এবং সুনিপুণ বিন্যাসযোগ্যতায় তাঁর গীতে মুগ্ধ শ্রোতারা শতমুখে প্রশংসা করেছে। তাই কয়েকশত বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনও এদেশে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের মধুর গীত ধ্বনিত হয়। কবির অবলম্বিত রাগ-রাগিণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : মহারট্টীরাগ, শ্রীরাগ, পূরবীরাগ, সিন্ধুড়া রাগ, সুহই রাগ, বেলোয়ার রাগ, গৌরী রাগ, পঠমঞ্জরী রাগ, ধানশী রাগ, বরাড়ী রাগ, কামোদরাগ, বাতাবন্দ তুড়ি রাগ, বালাধানশী রাগ, বসন্ত রাগ, মালশী রাগ, শ্যাম রাগ, রামকিরি রাগ, কৌরাগ, গবড়া রাগ, গান্ধার, পাহিড়া রাগ, ভাটারী রাগ, মালবী রাগ, মায়ুর রাগ,

কেদার, কল্যাণ রাগ, মঙ্গল, আহিরী রাগ, বিভাস রাগ, গুঞ্জরী রাগ, করুণ রাগ ইত্যাদি। উপর্যুক্ত বিবিধ রাগ-রাগিণী সঙ্গীতসম্বন্ধে কবির বিস্তৃত ও ব্যাপক জ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার পরিচয় উপস্থাপন করে।

কবির 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-কাব্যের বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে গোপনারীদের সঙ্গে কৃষ্ণের লীলা। কৃষ্ণের প্রেমে আত্মহারা ব্রজের সমস্ত গোপনারী। কৃষ্ণের সুমধুর বাঁশীর সুর তাদেরকে মোহনীয় আবেশে প্রিয়ের সান্নিধ্য লাভের আকর্ষণে ঘর থেকে বের করে আনে। তারা প্রচলিত পারিবারিক ও সামজিক রীতি-নীতি এবং অন্যান্য সমস্ত কর্মকথা বিস্মৃত হয়। ব্রজের বধূদের কুলত্যাগে বাধ্য করার স্বীয় সম্মোহনী শক্তি সম্পর্কে কৃষ্ণ নিজেও অবগত।

কৃষ্ণের এ-ধরনের ভূমিকার কথা কবিরও অজানা নয়। তবু এই কৃষ্ণ যেহেতু কবি মাধবাচার্যের আরাধ্য এবং কৃষ্ণের মাহাত্ম্যবর্ণনা ও গুণকীর্তনই গ্রন্থে তাঁর উদ্দেশ্য, সেহেতু কবি সামাজিক দৃষ্টিতে সমাজবিগর্হিত কৃষ্ণচরিত্রকে নানান অসঙ্গতকর্মের দায়ভার থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। কিছু পরিমাণে হলেও এ-অপবাদ থেকে কৃষ্ণকে মুক্তি দিতে তাঁর সচেতন প্রচেষ্টা কাব্যের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লক্ষ করা যায়। তাই কৃষ্ণের কপটবাণীর মাধ্যমে কবি সুকৌশলে গোপনারীদের ধর্মকথা শুনিয়েছেন। আর কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা এবং কৃষ্ণের ইঙ্গিতেই গৃহত্যাগী গোপীদেরকে কবি প্রদান করেছেন গৃহপ্রত্যাবর্তনের চাতুরীপূর্ণ পরামর্শ।

পরম সুন্দরী যদি সর্ব্বগুণাশ্রয়।
পরস্বামী অভিলাষে ধর্ম্ম নষ্ট হয়।।
দুঃশীল দুর্ভাগা রোগী বৃদ্ধ বা নির্দ্ধন।
তবু সতীজন/পতি না ছাড়ে কখন।।
পতি বিনা রমণীর আর নাহি গতি।
কেমনে জানিবে তুমি নাগরিক মতি।।
নিজ পতি সেবা পরিজনের পোষণ।
নারী হয়ে না করিলে বড় অভাজন।।
না করি বিলম্ব সভে লড় নিজ ঘরে।
স্নেহের কারণে ধর্ম্ম বুঝাই তোমারে।। (পৃ. ৯৫)

গোপনারীরা যে একান্তভাবে নিজেদের অভিলাষ পূরণের জন্য ও আপন ইচ্ছাতেই গৃহত্যাগে আগ্রহী হয়েছে, তাদের কাছ থেকে এ-বিষয়ে সমর্থন আদায় করতেই

কবির এ-প্রচেষ্টা। যা পরনারীকে গৃহত্যাগী করার অপবাদ থেকে কৃষ্ণকে কিছুটা অব্যাহতি দেয়। কৃষ্ণের প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ ও কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই কবি এ-ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে কবির সাফল্য ষোলআনা। এ-প্রসঙ্গে নিজেদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে গোপনারীর স্বীকারোক্তি কবির সাফল্যের প্রমাণ বহন করে।

শৈশব কাল ধরি, তুয়াপদে অনুসরি
অবহু অধিক অনুগতি।
গুরু মুনি বন্দন, ভকত জীবন ধন,
দুখিনী উপেক্ষা অনুচিতি।।
ওহে মাধব কাহে নিঠুর কহসি।
সব আশা পরিহরি, তুয়াপদ অনুসরি,
চরণ সেবন অভিলাষী।।
না তেজ না তেজ হরি, ভজহুঁ ভকত নারী,
না তেজ-সুদৃঢ় আশাপাশে।
তুয়া আশা করি তেঞি, বহুত অসতী মুঞি,
সুত-পতি কিছুই না বাসে ।।
শ্রবণ শুনিতে বৈরী, হরল পরাণ মেরি,
তোঁহারি বংশীর নাদ শুনে।
এ তিন ভুবন ভরি, আছয়ে যতেক নারী,
সতী বোলাইব কোন জনে।।
যত দেখ চরাচর, যতেক শরীর ধর,
তুমি সে তাহার এক গতি। (পৃ. ৯৬)

কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনই তাদের পরম চাওয়া। কৃষ্ণ তাদের পরম গতি। সুতরাং তার সঙ্গে মিলনের বাসনা স্বতঃপ্রণোদিত।

রাধা ও অন্যান্য গোপনারীর সঙ্গে কৃষ্ণের লীলার যে বর্ণনা, তা আদিরসাত্মক। কবির এ-বর্ণনার সঙ্গে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে'-র বর্ণনার অনেকটাই মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বিস্তৃতভাবে বর্ণিত এ-বর্ণনায় কবি মাধবাচার্য পুরোপুরি সংযত নন। এ-প্রসঙ্গে এ-মন্তব্য বোধ হয় অমূলক নয় যে পাঠক-শ্রোতাদের মানসিকতার সঙ্গে যোগসূত্রসৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এ-ধরনের আদিরসাত্মক বর্ণনার

বিস্তৃতি ঘটেছে। রাধা ও অন্যান্য গোপনারীর সঙ্গে কৃষ্ণের লীলার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা প্রদান থেকে এ-মন্তব্য সমর্থিত হয়। তবে এ-ব্যাপারেও কবির যে সাফল্য তা ভাষা ও শব্দপ্রয়োগের সচেতন ও সুনিপুণ সতর্কতায়। ভাষাব্যবহারের চমৎকারিত্বেই তাঁর এ-বর্ণনা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র বর্ণনার মাত্রাগত আধিক্যকে এবং নগ্নতাকে কিছুটা এড়িয়ে যেতে পেরেছে।

ক. রমই মাধাই গোপ রমণী।
নিকুঞ্জ শয়নে এ সুখ শয়নী।।
অধরে অধরে সঘন চুম্বন।
কুচে নখাঘাত কর পীড়ন।।
জঘনে জঘনে সঘনে মেলি।
গানে মাধব অপার কেলি।। (পৃ. ৯৮)

খ. রসয়ে কানাই রাধা রমণী।
নিকুঞ্জ-সদনে সুখ শয়নী।।
অধরে অধরে ঘন চুম্বন।
কুচে নখাঘাত রুধির পতন।।
জনে জনে চুম্বন কেলি। (পৃ. ৯৯)

কবির বর্ণনা এখানেই শেষ নয়। বরং রমণ-উন্মত্ত কৃষ্ণের বেপরোয়া ভোগ-লিপ্সায় রাধা ক্ষত-বিক্ষত ও কাতরা। কৃষ্ণের কাছ থেকে সংযত ব্যবহারের আশায় তাই তার অনুরোধ পরিত্যক্ত হয়। কবি কৃষ্ণ-আক্রান্ত রাধার শারীরিক অবস্থা ও যন্ত্রণার বর্ণনা প্রদান করেছেন সবিস্তারে।

ছাড় ছাড় গোঙার আমার নাহি কাজ।
ভাল ভাল বলিতে খাইলে লোক লাজ।।
তুমি ময়-মত্ত হাথী হাম ফুল খানি।
দ্বিরদ বিহার কত সহে কমলিনী।।
কে কহে দয়াল তুমি নিষ্ঠুর মুরারি।
এ বুঝি প্রকারে বধ কৈলে গোপনারী।।
সত্য যদি নেহা রাখ রাখ রাই তনু।
ধীরে ধীরে রমণ করহ অনুদিনু।।
নখাঘাতে জর্জ্জরিত নব-কুচ-ভারা।

নিরবধি দহে প্রাণ বিষ বিষ জরা।।
অধর নীরস নাসা বহে ঘন শ্বাস।
কহনে না যায় পাপ জঘন আওয়াস।। (পৃ. ৯৯)

যেহেতু জনপ্রিয়তা অর্জন ও মানুষের চিত্ত-আকর্ষণ কবির অন্যতম লক্ষ্য, সেজন্যই কাব্যে শ্রীরাধা ও কৃষ্ণের আদিরসাত্মক মিলন বর্ণনা ও গোপনারীদের সঙ্গে কৃষ্ণের যথেচ্ছ বাসনাবিলাসচিত্রের ছড়াছড়ি। তবে এ-ধরনের কামোদ্দীপক বর্ণনাবাহুল্য সত্ত্বেও কবির ভাষা ব্যবহার-নৈপুণ্যে তা সস্তা রসবিতরণের উপকরণ হয়ে দাঁড়ায়নি। আর কবির সচেতনতা এবং শিল্পচাতুর্যই এ-বিষয়ে তাঁর সাফল্যের মূলকারণ, একথা অনস্বীকার্য।

বাংলার লোক-সংস্কৃতিকে এই বাঙালি কবি ধারণ করেছিলেন তাঁর হৃদয়ের গভীরে। তাই গ্রন্থের 'নৌকাখণ্ডে' এদেশীয় সারিগানের প্রভাবে তাঁর কৃষ্ণ প্রভাবিত হয়েছে। তা ছাড়াও চিরায়ত বাঙালি ললনার দৈনন্দিনজীবনাচার ও স্বভাবধর্মও গ্রন্থমধ্যে স্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে।

ক. কানু মুখে সারি গায় স্বর জুড়ি
হিঁঅই হিঁঅই বল্যে।। (পৃ. ৭৬)

খ. কেহ কেহ ত্যাজিলেক ধেনুর দোহন।
কেহ কেহ পরিহরি দুগ্ধ আবর্ত্তন।।
কেহ কেহ ত্যাজিলেক রন্ধন ভোজন।
কেহ শয্যা ত্যাজি কেহ পতির সেবন।। ...
কেহ কেহ দেয় এক নয়নে অঞ্জন। (পৃ. ৯৪)

গ্রন্থে বাঙালি সমাজ-জীবনে প্রচলিত বিশ্বাস-সংস্কারও প্রযুক্ত হয়েছে। চিন্তাকাতরা রুক্মিণীর মানসিক অবস্থার সুস্পষ্ট চিত্র উপস্থাপন করতে, কবি কর্তৃক বাংলার লোকবিশ্বাস-সংস্কারের উল্লেখও লক্ষণীয়।

এতেক ভাবিয়া দেবী ক্রন্দন করিতে।
বামউরু-নয়ন স্পন্দন আচম্বিতে।। (পৃ. ১৮৬)

পুরাণ এবং ভারতের বিহার প্রদেশের আভীর সম্প্রদায়ের লোককাহিনীভিত্তিক রচনা হলেও 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-কাব্যে এদেশীয় সমাজ-জীবনসম্পৃক্ত প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনের সার্থক প্রয়োগ দেখা যায়। লক্ষণীয় যে এসব প্রবাদ-প্রবচন মূলকাহিনীর প্রবহমানতা ও অভীষ্ট ভাবপ্রকাশেরও সহায়ক হয়েছে।

ক. ভাটীর তরঙ্গে যেন মেলিলেক বা।
তরঙ্গ আনন্দ ঢেউ স্থির নহে না।। (পৃ. ১০৫)

খ. কাটা গায়ে দিল যেন জামিরের রস। (পৃ. ১০৫)

'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-কাব্য ভাগবতের নির্দিষ্ট অংশের অনুবাদ বলে কবির নিজস্ব প্রতিভা ও কৃতিত্ব প্রকাশের সুযোগ ছিল সীমিত। তথাপি কবি নতুনত্ব আনয়নের লক্ষ্যে এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে চেয়েছেন। বিষয়ের দিক থেকে একথা যেমন সত্য, তেমনি গঠনরীতির দিক থেকেও সত্য। আর কবি বাঙালি হলেও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর বেশ দখল ছিল। কাব্যে মাঝে মাঝে সংস্কৃত ভাষার পদরচনায় তাঁর কৃতিত্ব সাফল্যের প্রান্তসীমা স্পর্শ করেছে। বিশেষ করে রূপবর্ণনায় সংস্কৃত অলঙ্কারবহুল ভাষাব্যবহারে কবি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

বিপুল বক্ষতট, কুচ কাঞ্চন ঘট,
মদনরাজ জয় বাণ।
কুসুম কস্তুরি, সুচারু কাঁচুলি,
হীরক হার সুঠান।।
বাহু মৃণাল, বিশাল বনমাল,
রসনাকুল কটিবন্ধে।
পট্ট নিচোল, পরিধেয় অঞ্চল,
চঞ্চল অবিরত কন্ধে।। (পৃ. ৯৪)

ব্রজবুলি ভাষায়ও ছিল তাঁর বিশেষ দখল। গ্রন্থে ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদগুলো পাঠ করে ধারণা করা যায় যে বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যসম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে জ্ঞাত ছিলেন। হাম, নেহা, অবহুঁ, তুয়া, কহসি, ভেল, পেখি, জীউ, রহু, হাথ, তোহারি, বরিখে প্রভৃতি অজস্র ব্রজবুলি শব্দ এই কাব্যে পরিদৃষ্ট হয়। মধ্যযুগীয় বৈষ্ণবপদাবলীসাহিত্যের কবি বিদ্যাপতি-সৃষ্ট ব্রজবুলি ভাষার ব্যাপক প্রভাব থেকে এই বাঙালি কবি নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেননি। বিষয়গত সাদৃশ্যের কারণে বাংলার কবি মাধবাচার্যের কাব্যের সর্বত্র ব্রজবুলি ভাষা ও শব্দের প্রচুর ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

এ ধ্বজ অঙ্কুশ বজ্র যব পরতেখ।
হাম দুখমতি, এই দুর গতি,
দেখিতে-ভেল আদেখ।।
হরিপদ-চিহ্ন এই, হোর দেখ সই,

দোসর পেখি নাগরী।
শ্রীহরি ধ্বনি হোর দেখ শুনি,
সেই সে অপ আপরি।। (পৃ. ১০৪)

শুধু এ-ধরনের শব্দ ব্যবহারের মধ্যেই কবি সীমাবদ্ধ থাকেন নি ; ব্রজবুলির আশ্রয়ে তিনি সম্পূর্ণ 'গীত'-ও রচনা করেছেন। গ্রন্থের 'রাসলীলা', 'শ্রীকৃষ্ণের বিদায় প্রার্থনা', 'অক্রূরের যমুনা তীরে গমন' প্রভৃতি অংশ এর সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। বাংলার হিন্দুসমাজের ঘরে ঘরে জনপ্রিয় 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-কাব্যকে সর্বসাধারণের উপযোগী করার লক্ষ্যে কবি 'পাঁচালী'-র রচনাভঙ্গি অনুসরণ করেছিলেন। তাই গ্রন্থে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর উল্লেখ যেমন পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি লৌকিকভাষার প্রভাবও অনেক। কবি তাঁর পারিপার্শ্বিকতা এবং সমাজ ও প্রাত্যহিকজীবনকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। তাই সমকালীন সমাজজীবনে চালু গণমানবের মুখের ভাষায় ব্যবহৃত শব্দও প্রযুক্ত হয়েছে তাঁর কাব্য-ভাষায়। তাই কাব্য-রচনাস্থান টাঙ্গাইল- অঞ্চলে প্রচলিত শব্দের উপস্থিতি সঙ্গত কারণেই লক্ষ করা যায়। এ-সব শব্দের ব্যবহার বর্তমান কালেও এ-অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে। এগুলোর ব্যবহার অন্য অঞ্চলের কথ্য ও লেখ্য ভাষায় সাধারণত কমই দেখা যায়। ঢাঁট (নির্লজ্জ), গুঁড়া (নৌকার অংশ বিশেষ), মায়্যা (মেয়ে), দেআ (বৃষ্টি), ফুটি ফুটি (একটু একটু), জড় (একত্রিত), হয়্যা (হয়ে), ছাপায়্যা (ছাপিয়ে) ইত্যাদি অনেক আঞ্চলিকশব্দের ব্যবহার এই কাব্যে গোচরীভূত হয়।

ক. হেদে লো গোআলার, মায়্যা বুঝিল,
বড়ই তুমি ঢাঁট। (পৃ. ৭৫)

খ. গুঁড়া চাপি চাপি বৈসে সব গোপী
পসরা লইয়া কোলে। (পৃ. ৭৬)

গ. জল ফুটি ফুটি সেচে বড়াই। (পৃ.৭৮)

ঘ. দেআ মেলিল বিষম বা। (পৃ. ৭৬)

ঙ. জড় হয়্যা বহি চাহি যেন তরুগণ।। (পৃ. ১২০)

চ. গুঁড়া ছাপায়্যা ভরিছে পানী।। (পৃ. ৭৬)

কবি যে তাঁর কাব্য-ভাষায় লৌকিকভাষার আশ্রয় গ্রহণ করবেন, তা তিনি গ্রন্থের 'মঙ্গলাচরণ'-অংশেই স্বীকার করেছেন। এ-ধরনের ভাষাব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। যেহেতু সংস্কৃত ভাষাসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ সাধারণ মানুষের কাছে কৃষ্ণের মাহাত্ম্য-কথা পৌঁছে দেওয়াই ছিল তাঁর মুখ্যউদ্দেশ্য।

ভাগবত সংস্কৃত না বুঝে সর্ব্বজনে।
লোকভাষা-রূপেতে কহিব পরমাণে।। (পৃ. ২)

ভাষাবিচারের শেষ পর্যায়ে বলা যায়, এ কাব্যের ভাষা পরিচ্ছন্ন এবং এ-পরিচ্ছন্ন ভাষা ব্যবহারে কবির কৃতিত্ব প্রশংসনীয়।

'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-কাব্যে কবি মূলত পয়ার ও ত্রিপদী (দীর্ঘ ও লঘু) ছন্দ ব্যবহার করেছেন। কাব্যে ব্যবহৃত এই পয়ার চতুর্দশাক্ষরবিশিষ্ট। পয়ারের এই মাত্রা কাব্যের সর্বত্র অভিন্ন। অসঙ্গতি খুব কমই চোখে পড়ে।

এতসব বিলাপ করিয়া গোপীসব।
মনোহর উচ্চস্বরে করয়ে বিলাপ।।
শুনিতে শুনিতে দয়া জন্মিল হৃদয়।
প্রেমের ঠাকুর প্রভু হইলা সদয়।। (পৃ. ১২১)

ত্রিপদী ছন্দের ক্ষেত্রে কবি ৬/৬/৮- মাত্রার লঘু ত্রিপদী এবং ৮/৮/১০- মাত্রার দীর্ঘ ত্রিপদী ব্যবহার করেছেন।

লঘু ত্রিপদী : অজয় অভয়, সেই মহাশয়,
দৈত্য কুলান্তককারী।
দৈবকী জঠরে, স্থান কুতূহলে,
মধুপুরে অবতারী।। (পৃ. ১৭৮)

দীর্ঘ ত্রিপদী : চন্দ্রাতপ ধারে ধারে, লম্বিত মুকুতা ঝারে,
বধু ষোল সহস্র মন্দিরে।
তার মধ্যে এক ঘরে, প্রবেশিলা মুনিবরে,
পরিজ্ঞান হরিষ-অন্তরে।। (পৃ. ২৪৪)

তবে পয়ারের ক্ষেত্রে তিনি যে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন, ত্রিপদী ছন্দের ক্ষেত্রে তা পারেননি। কেননা কাব্যে ব্যবহৃত ত্রিপদীর মাত্রাগতঅসঙ্গতি কাব্যের বহুস্থানে পরিদৃষ্ট হয়। আবার ছন্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কবি বৈচিত্র্য আনার চেষ্টাও করেছেন। ছন্দ-বৈচিত্র্যের মাধ্যমে নিজস্ব নৈপুণ্য প্রদর্শনের ইচ্ছা ছিল কবির। তাই কোনো কোনো স্থানে প্রচলিত ত্রিপদী ছন্দেই বৈচিত্র্য আনার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

চাঁদ মুখি কহ নিজ বিবরণ।
জিজ্ঞাসি তোমারে শুনহ বচন।।
শুনি বীরবাণী, কহে সেই ধনী,

কি আর কহিব মিছা।
সূর্য্যের নন্দিনী, আমিত পদ্মিনী,
কৃষ্ণপতি করি ইচ্ছা।।
কালিন্দী নাম বিদিতা।
কায়মনোবাক্যে, হরি অনুগতা।। (পৃ. ২০৫)

পরিশেষে বলা যায়: টাঙ্গাইলবাসী কবি মাধবাচার্যের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি এই 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'-কাব্য। কবি তাঁর কবিত্বের সুকোমল পরশে শ্রীকৃষ্ণের মহিমময় মাহাত্ম্যের কথা উপস্থাপন করেছেন এবং তার মোহময় রূপসৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন; যে কারণে রচনাকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এ-কাব্যগ্রন্থটি বাংলার হিন্দুসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়ে আসছে। বাঙালি কবির সংস্কৃত পুরাণ-নির্ভর এ-কাব্যরচনার প্রয়াস ও জনপ্রিয়তা বিশেষ প্রতিভা ও কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে। কবির এই সাফল্য বাংলার সাহিত্যসেবী ও বিদগ্ধ মানুষের গৌরবের বিষয়।

চার : ভবানীপ্রসাদ রায়

অন্ধকবি হোমার ও মিল্টন বিশ্বসাহিত্যের দুই দিক্‌পাল। অন্ধ হলেও নিজ নিজ দেশ গ্রীস ও ইংল্যাণ্ডের সাহিত্যগৌরব বৃদ্ধির মধ্যেই তাঁদের নিজস্ব প্রতিভা সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং তাঁদের প্রতিভা বিশ্বসাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশ্ববিশ্রুত এরূপ প্রতিভার অধিকারী কোনো ব্যক্তির আবির্ভাব না ঘটলেও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা একজন জন্মান্ধ কবির পরিচয় পাই। যিনি তাঁর প্রতিভা ও যোগ্যতায় বিশ্বসাহিত্যে স্থান করে নিতে সমর্থ না হলেও, আমাদের সাহিত্যের গৌরব কিছুটা বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের এই জন্মান্ধ কবি—ভবানীপ্রসাদ রায়।

প্রাচীন আটিয়া পরগনার (আধুনিক টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর থানার) অন্তর্গত কাঁটালিয়া (কাঁঠালিয়া) গ্রামে কবি ভবানীপ্রসাদ রায়ের জন্ম। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'দুর্গামঙ্গল' দেবী দুর্গার মাহাত্ম্যপ্রকাশক মঙ্গলকাব্য। 'দুর্গামঙ্গল'-কাব্যে কবির আত্মপরিচয়সম্পর্কিত বক্তব্যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

কাঁটালিয়া গ্রামে পরগণে আটিয়া।
তথায় বসতি করি ... ।। (পৃ. ২৯৪)

কবি ভবানীপ্রসাদ জন্ম থেকেই চক্ষুহীন ছিলেন। তাঁর পিতার নাম নয়নকৃষ্ণ রায়। কবি বাল্যেই তাঁর পিতামাতাকে হারান। মাতৃপিতৃহীন এই কবিকে তাই জীবনের শুরুতেই সীমাহীন দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হতে হয়।

নয়নকৃষ্ণ রায় নামে ছিল মহাশয়।
চক্ষুহীন আমি ছার তাহার তনয়।।
মাতাপিতা রহিত হইল অল্পকালে।
এহিমতে বিধি বড় ফেলিল জঞ্জালে।। (পৃ. ২৯৪)

জন্মান্ধ এই কবি জন্মগ্রহণ করেন বৈদ্যবংশে। জন্মের পর থেকেই কবিকে বিবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হতে হয়। কবি ভবানীপ্রসাদকে জীবনের নানা পর্যায়ে নিগৃহীতও হতে হয়েছে। তাই সামান্য সময়ের জন্যও তিনি নিজের অসহায়ত্বের কথা বিস্মৃত হতে পারেনি। এ-কারণেই তাঁর কাব্যে বারবার অন্ধজীবনের গ্লানিকর যন্ত্রণার কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

নিবাস কাঁঠালিয়া গ্রাম বৈদ্যকুলে জাত।
দুর্গার মঙ্গল বোলে ভবানী প্রসাদ।।
মনে দৃঢ় করিয়াছি ভবানীর পদ।
রচিলা ভবানীমঙ্গল ভাবিয়া বিষাদ।।
জন্মকাল হৈতে কালী করিলা দুঃখিত।
চক্ষুহীন করি বিধি করিলা লিখিত।।
কি উপায় করিব আমি সদায় চিন্তিত। (পৃ. ২০০-০১)

কবির পূর্বপুরুষের উপাধি ছিল 'কর'। তবে তাঁর বংশের অনেকেই 'রায়' উপাধি ব্যবহার করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। কালক্রমে বংশগত উপাধি হিসেবে 'রায়'-ই প্রাধান্য লাভ করে। কবি নিজেও রায় উপাধিই ব্যবহার করতেন।

কাঁটালিয়া গ্রামে বাস কর-বংশে উৎপত্তি।
নয়নকৃষ্ণ নামে রায় তাহার সন্ততি।। (পৃ. ১১৩)

বাল্যকালে মাতৃপিতৃহীন অন্ধ কবির সীমাহীন দুঃখযন্ত্রণার বর্ণনা অন্তরস্পর্শী। কাশীনাথ নামে কবির এক জ্ঞাতি-ভাইয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। কবির প্রতি তার ব্যবহার ততটা অস্বাভাবিক ছিল না। তবে কবির প্রতি কাশীনাথের দুই ছেলের, বিশেষ করে ছোট ছেলের দুর্ব্যবহার ছিল বর্ণনাতীত। পরশ্রীকাতর-পরস্ত্রী আসক্ত অসচ্চরিত্র এই ছেলে অন্ধ পিতৃব্যের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধা কিংবা সহানুভূতিও প্রদর্শন করেনি।

জ্ঞাতি-ভ্রাতা আছে আমার নাম কাশীনাথ।
তাহার তনয় দুই কি করিব সম্বাদ।।
জ্ঞাতি-ভাই করি তেহঁ করেন আপ্লিত।
তাঁহার তনয় হএ কহিতে অদ্ভুত।।
কনিষ্ঠ পুত্রের গুণ ভুবন বিদিত।
পরদ্রব্য পরনারী সদায় পীরিত।। (পৃ. ২০১)

বিদ্যাশিক্ষার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন এবং নেশাগ্রস্ত এই ছেলে সর্বদা কবির প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করতেন। কবির বংশের ধ্বংসকারী হিসেবে চিহ্নিত, কবির প্রতি বিরূপ এবং কবির নির্যাতনকারী এই অসচ্চরিত্র ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যুকামনা করতেও কবি দ্বিধা করেননি। কবির বক্তব্য থেকে কবির প্রতি তার অত্যাচারের তীব্রতা সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

বিদ্যা উপার্জ্জনে তার নাহি কোন লেশ।
পিতা পিতামহ নাম করিল নিকেশ।।
দীর্ঘটানে সদা তেহঁ থাকেন মগন।
জ্ঞাতি-বন্ধু সহ তার নাহিক মরণ।।
তাহার চরিত্রগুণ কি কহিব কথা।
খুড়া প্রতি করে তেহ সদায় বৈরিতা।। (পৃ. ২০১)

কবি তাঁর জ্ঞাতি ভ্রাতা, বিশেষ করে তার দুই অত্যাচারী পুত্রের হাত থেকে মুক্তি লাভের মানসে স্মরণ করেছেন দেবী ভগবতীকে। দেবীর কাছে এ-শরণ প্রার্থনায় কবির আকুল আবেদনে পাঠকহৃদয় বেদনার্ত না হয়ে পারে না।

ক. এহি দুঃখে কালী মোরে রাখিলা সদায়।
তোমার চরণ বিনা না দেখি উপায়।।
দুষ্ট-হাত হৈতে কালি কর অব্যাহতি।
তুমি না তরাইলে মোর হবে অধোগতি।।
মনে ভাবি তোমার পদ করিয়াছি সার।
এ দুষ্টের হাত হৈতে করহ উদ্ধার।।
আমি অঙ্গক্রিয়াহীন না দেখি উপায়।
শরণ লইয়াছি মাতা তব রাঙ্গা পায়।। (পৃ. ২০১-০২)

খ. তাহাতে ভরসা কালি চরণ তোমার।
বন্ধুহীন হইয়াছি করহ উদ্ধার।। (পৃ. ১৫৪)

গ. ভবানী প্রসাদ বলে ভবানীর পায়।
জন্মঅন্ধ ভগবতী কৈরাছ আমায়।।
'এ জনমের মত মোর নহিবে মোচন।
কৃপা করি আসি অন্ধের কর পরিত্রাণ।। (পৃ.১১৩)

কবি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবহীন অন্ধজীবনে একমাত্র দেবীর শরণ ছাড়া তাঁর গত্যন্তর নেই। তাই দেবীর প্রতি তাঁর নিঃসঙ্কোচ আত্মনিবেদন :

মনে দঢ়াইয়াছি আমি কালীর চরণ।
দাঁড়াইতে আমার নাহিক কোন স্থান।। (পৃ. ২০১)

কবি অন্ধ ও নিরক্ষর, তাই বলে মূর্খ ছিলেন না। তাঁর মধ্যে কবিত্বশক্তির প্রকাশ ঘটে বাল্যকাল থেকেই। অল্প বয়সেই তিনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করতেন। এমনকি অন্যের কাছ থেকে শুনে মুখে মুখেই তিনি সংস্কৃত ভাষা আত্মস্থ করেন এবং পারদর্শিতাও অর্জন করেন।

কবি রচিত এ-কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে মোটামুটি একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। 'দুর্গামঙ্গল'- কাব্যে উপস্থাপিত কালনির্ণায়ক কবিতাংশই এতে প্রধান সহায়ক। মধ্যযুগীয় প্রথা অনুযায়ী কবি হেঁয়ালির মাধ্যমেই তাঁর গ্রন্থের রচনাকাল উল্লেখ করেছেন। কালনির্ণায়ক চরণ দু'টি হলো :

চন্দ্র মুনি ** আর দিক নিয়া সাথে।
রচিল পুস্তক রায় প্রকাশ করিতে।। (পৃ. ২৯৪)

কালনির্ণায়ক এ দু'টি অসম্পূর্ণ কবিতার চরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে রসিকচন্দ্র বসু— গ্রন্থের রচনাকাল ১০৭১ বঙ্গাব্দ (১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দ) বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তিনি 'দিক'-শব্দে দশদিক বিবেচনা করে দশ সংখ্যা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[২৪] তবে কালজ্ঞাপক কবিতার চরণে বর্ণলুপ্তির যে প্রমাণ রয়েছে, সে সম্পর্কিত কোনো সমাধান তাঁর বিশ্লেষণে নেই। সঙ্গত কারণেই এ-গ্রন্থের সম্পাদক ব্যোমকেশ মুস্তফী এ-কাল-তথ্যকে নির্ভরযোগ্য মনে করেননি। তিনি বিবিধ বিবেচনায়, বিশেষ করে কাব্যের রচনারীতির আলোকে এ-গ্রন্থকে আরো প্রাচীন বলে শনাক্ত করেছেন। তাঁর মতে, ভবানীপ্রসাদ রায় চৈতন্যযুগের অব্যবহিত পরের কবি। তাঁর এ-মন্তব্যে কাব্যের অন্তর্গত 'চৈতন্যবন্দনা'-ও অর্থহীন হয় না।

গুপ্ত-বৃন্দাবন বন্দিলাম নবদ্বীপ পুরি।
যথায় অবতীর্ণ রূপ হৈল গৌরহরি।।
জগত নিস্তারিতে শচীর কুমার।
নদীয়া পুরে আসি কৈল জগত উদ্ধার।। (পৃ. ৪)

অবশ্য ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরসিকচন্দ্র বসুর কালনির্ণায়ক তথ্যকেই গ্রহণ করেছেন। এ-হিসেবে কবি ভবানীপ্রসাদ সতেরো শতকের কবি। সুতরাং তাঁর আবির্ভাব ষোল, না সতেরো শতকে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ প্রমাণ মিলছে না।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (কলিকাতা) থেকে ১৩২১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ভবানীপ্রসাদ রায়ের এ-গ্রন্থটি 'দুর্গামঙ্গল'- নামে প্রকাশিত হয়। অবশ্য ১৩০৩ বঙ্গাব্দে রসিকচন্দ্র বসু পাঠক ও বিদ্বৎ-সমাজে প্রথম ভবানীপ্রসাদ রায়কে পরিচায়িত করেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় এ-কবি সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধে গ্রন্থটির নাম 'দুর্গামঙ্গল' বলেই উল্লেখ করেন। ধারণা করা যায়, গ্রন্থের নামকরণে তিনি গ্রন্থে উল্লিখিত বিভিন্ন চরণ বিশ্লেষণ করেই এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

ক. ভবানী প্রসাদ বলে দুর্গার মঙ্গল।। (পৃ.৫)
খ. রচিলা প্রসাদরায় দুর্গার মঙ্গল।। (পৃ. ১৫৫)
গ. রচিল ভবানী রায় দুর্গার মঙ্গল।। (পৃ. ২৯৪)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলোতে 'দুর্গারমঙ্গল' শব্দের সঙ্গে পরিচয় ঘটলেও, গ্রন্থনাম হিসেবে নির্ধারিত 'দুর্গারমঙ্গল' কথাটি গ্রন্থে কমই পাওয়া যায়। তাছাড়া চরণে প্রযুক্ত 'দুর্গারমঙ্গল'-শব্দটি যে-অর্থে বা রীতিতে ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে একে গ্রন্থনাম হিসেবে গ্রহণ করা সমীচীন নয়। এই বিবেচনায় গ্রন্থ-সম্পাদকের মন্তব্য ও বিশ্লেষণই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। যদিও সম্পাদক কবি ভবানীপ্রসাদের প্রথম পরিচায়ক রসিকচন্দ্র বসুর দেওয়া 'নাম'-ই শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করেছেন, তবু, সম্পাদকের মতে, গ্রন্থটির নাম 'ভবানীমঙ্গল' নির্ধারণ করাই সঠিক ছিল।

ক. যেবা পড়ে যেবা শুনে ভবানীমঙ্গল। (পৃ. ২৯৩)
খ. এহিমতে সাঙ্গ হইল ভবানীমঙ্গল।। (পৃ. ২৯৩)
গ. শ্রীগুরু চরণ ধরি ভবানী প্রচার করি
প্রকাশিলা ভবানীমঙ্গল।। (পৃ. ৯৩)

অন্যান্য যেসব কবি দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্যকে কাব্যরচনার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাঁদের রচনা পুরাণশাস্ত্রের সঙ্গে ততটা ঘনিষ্ঠসূত্রে সম্পর্কিত নয়। ষোল-

সতেরো শতকে শিক্ষিত সমাজে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত 'দুর্গা সপ্তশতী'-অংশে উপস্থাপিত দেবী চণ্ডী কর্তৃক দৈত্য-দানব নিধনের কাহিনীর যে প্রভাব ও প্রসার ঘটে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে কবি ভবানীপ্রসাদ রায়ের 'দুর্গামঙ্গল'-এর সৃষ্টি। তাঁর এ-গ্রন্থ 'দুর্গাসপ্তশতী'-র অনুবাদ। তবে মূলানুগ অনুবাদ এটি নয়, ভাবানুবাদ। 'দুর্গাসপ্তশতী'-র বাইরে অন্য পুরাণের প্রভাবও এতে বিদ্যমান। এটি অনুবাদ হলেও অনুবাদকর্মে কবির নিজস্ব প্রতিভা ও কৃতিত্বের স্ফুরণ ঘটেছে, যা তাঁর সচেতন মানসবোধেরই প্রতিফলন। এ-সম্পর্কে কাব্যোল্লিখিত তাঁর স্বীকারোক্তি স্মরণযোগ্য।

শ্লোক ভাঙ্গি লিখি যদি পুস্তক বাড়য়।
সংক্ষেপে কহিলাম কিছু বুদ্ধে যেহি লয়।।
শ্রীগুরুর চরণ ভাবিয়া অনুক্ষণ।
ভবানীপ্রসাদ মাগে ও রাঙ্গা চরণ।।
জন্মঅন্ধ বিধাতা যে করিলা আমারে।
অক্ষর- পরিচয় নাহি লিখিবার তরে।।
ভবানীর পাদপদ্ম করিএ মস্তকে।
বুদ্ধি অনুসারে কবিত্ব করিলাম পুস্তকে।। (পৃ. ১৩৭)

কাব্যের প্রতিটি শ্লোকের আগাগোড়া অনুবাদ না হলেও, স্থানে স্থানে অবশ্য এ-ধরনের হুবহু অনুবাদও দুর্লক্ষ্য নয়। আর সেসব ক্ষেত্রে তাঁর সরল-সুন্দর অনুবাদ, তাঁর কাব্যিক কৃতিত্বকে অপেক্ষাকৃত অধিক সমৃদ্ধি দান করে। চণ্ডীর বহুল পরিচিত 'যা দেবী সর্বভূতেষু' শ্লোকের অনুবাদ অভূতপূর্ব সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করে। এর মাধ্যমে স্বল্পশিক্ষিত ও জন্মান্ধ কবি ভবানীপ্রসাদ রায়ের কাব্যপ্রতিভার ও রচনানৈপুণ্যের বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটেছে।

যেহি দেবী বুদ্ধিরূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে।।
যেহি দেবী লজ্জারূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে।।
যেহি দেবী ক্ষুধারূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে।
যেহি দেবী তৃষ্ণারূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে।।

যেহি দেবী দয়ারূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে।।
যেহি দেবী শক্তিরূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে।।... (পৃ. ১২১)

কবির এ-কাব্য পুরাণাশ্রয়ী রচনা হলেও, তিনি দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে পুরাণের ধারাবাহিক সীমানায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। মূল পুরাণ-কাহিনীতে যে ভাবে চণ্ডীমাহাত্ম্যের সূত্রপাত, এ-গ্রন্থে তাতে কিছুটা ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। কবি তাঁর গ্রন্থে মূল পুরাণকাহিনীর প্রারম্ভে কিছুটা অতিরিক্ত অংশ সংযোজন করেছেন। মূল মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রথম অংশ এ-গ্রন্থে একাদশ পরিচ্ছেদ ('সুরথ-প্রসঙ্গ')-রূপে সংযোজিত হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে 'সুরথের রাজ্য-প্রাপ্তি'-র ঘটনাবর্ণনার মাধ্যমে এর সমাপ্তি। এরপর কবি আবার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানলব্ধ কাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়েছেন। 'সুরথ-প্রসঙ্গ'-এর পূর্বে পুরাণ-অতিরিক্ত—রামের বিরহ, রাম ও অগস্ত্য-সংবাদ, মেনকা-স্বপ্ন, মৈনাক-প্রেরণ, মৈনাকের কৈলাসযাত্রা, মৈনাক-শিব সংবাদ, মৈনাক-গৌরী সংবাদ, শিব-গৌরী সংবাদ, গৌরী-বিদায়, হিমালয়ে গৌরীর আগমন— এই একাদশ পরিচ্ছেদ এবং পরে চণ্ডীপাঠফল, অগস্ত্য-রাম সংবাদ, শ্রীরামের দুর্গাপূজা, দেবী-স্তুতি, দেবীর বরদান, শিবের হিমালয়ে গমনোদ্‌যোগ, শিবের হিমালয়ে গমন, মেনকার খেদ, দেবীর কৈলাসগমন, দুর্গামঙ্গল প্রশংসা প্রভৃতি পর্যায়ক্রমিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সুতরাং কেবল গ্রন্থের 'মধ্যঅংশ' মার্কণ্ডেয় পুরাণের অনুসরণ। প্রারম্ভ ও সমাপ্তিঅংশ বাঙালি কবি ভবানীপ্রসাদ রায়ের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ফসল। তাঁর সর্বাধিক কৃতিত্বপূর্ণ সংযোজন বাংলাদেশে প্রচলিত দুর্গা-উৎসব প্রচলনের কিংবদন্তি এবং পূজাপ্রকরণ রীতি সম্পর্কিত বিবরণ।

... এহিমতে আছে গৌরী বাপের নিবাস।
সুগন্ধি চন্দনে কৈল গৌরী অধিবাস।।
পূজা প্রকাশিতে ইচ্ছা করিলা পার্ব্বতী।
কত কত দশভুজা হইলা পার্ব্বতী।।
হিমালয় পর্ব্বতে বসিয়া দশভুজা।
তথা বসি লইলেন ত্রলক্ষের পূজা।।
দশভুজা মহিষ মর্দ্দিনীরূপ ধরি।
স্বর্গমর্ত্ত পাতালে চলিলা মহেশ্বরী।। (পৃ. ৩৮)

কবি তাঁর কাব্যের শুরুতে বিষয়সূচী সম্পর্কে কাব্যাকারে একটি আগাম ধারণা প্রদান করেছেন। এ-থেকে সহজেই কাব্যে বর্ণিত কাহিনীর ধারাবাহিক ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

যে রূপে হৈল পূজা অকালে আশ্বিনে।
মন দিয়া সেহি কথা শুন সর্ব্বজনে।।
যেমতে আসিলা দেবী বাপের নিবাস।
ই তিন ভুবনে হৈল পূজার প্রকাশ।।
সৃষ্টির পত্তন মধু কৈটভ বিনাশ।
মৈষাসুর বধ দেবীর মাহাত্ম্য প্রকাশ।।
রক্ত বীজ বধ শুম্ভ নিশুম্ভ নিধন।
দেবতার স্তুতিবাণী সুরথ মোক্ষণ।।
যেন মতে রামচন্দ্র সমুদ্রের তীরে।
দশভুজা রূপে পূজা করিলা চণ্ডীরে।।
নিদ্রা হৈতে ভগবতীকে চৈতন্য করিয়া।
লঙ্কাজয়ী হৈল রাম তোমাকে সেবিয়া।।
গিরিপুরী হৈতে দেবী চলিলা কৈলাস।
যে রূপে রহিলা দেবী শিবের নিবাস।।
ই সব মাহাত্ম্য কিছু করিব প্রকাশ। (পৃ. ৪-৫)

কবি শুধু মার্কণ্ডেয় পুরাণের 'দুর্গাসপ্তশতী'-র চয়িত অংশের শুরুতে ও সমাপ্তিতে অতিরিক্ত অংশ সংযোজনের মাধ্যমে 'দুর্গামঙ্গল'- কাব্যের পরিপূর্ণতা দান করেন-নি এবং মূল পুরাণ- কাহিনীতে বর্ণিত পদ্ধতিতে দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনা করেননি; বরং কিছুটা স্বতন্ত্র ও ভিন্ন পদ্ধতিতে দেবী-মাহাত্ম্য বর্ণনার প্রয়াস গ্রহণ করেছেন। রাম লঙ্কা অভিযানের সময় সমুদ্রের বুকে জাঙ্গাল তৈরী করতে গিয়ে দেবীকে স্মরণ করেন। তাঁর মনে সবিস্তারে দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণ করার ইচ্ছা জাগ্রত হলে তিনি ঋষি অগস্ত্যকে অনুরোধ করেন, তা বর্ণনা করার জন্য। তখন ঋষি অগস্ত্য রামচন্দ্রকে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর কাহিনী শোনাতে শুরু করেন। এভাবেই শুরু হয়েছে কবির দুর্গামঙ্গল কাব্য। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী চণ্ডীর অবতরণিকা সবিস্তারে বর্ণিত হয়নি। তা মাত্র কয়েকটি শ্লোকে সীমাবদ্ধ। এতে দেবীমাহাত্ম্য-বর্ণনার সূত্রপাতও ভিন্ন প্রসঙ্গের সূত্র ধরে। "...স্বারোচিষ মন্বন্তরে জাত সুরথ রাজাই যে ভবিষ্যতে সবর্ণি

নামে অষ্টম মনু হইয়া জন্মিবেন, তাহা প্রমাণ করিয়া দেবী মাহাত্ম্যের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করিয়াছেন"।[২৪ক] কিন্তু বাঙালি কবি তাঁর কাব্যের অবতরণিকারূপে বাংলাদেশে প্রচলিত কিংবদন্তির আশ্রয় নিয়েছেন।

জন্মান্ধ কবি ভবানীপ্রসাদ রায় মুখে মুখেই বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষালাভ করেন। এতদ্বিষয়ক প্রামাণিক তথ্য আগেই উদ্ধৃত হয়েছে। তবে শুধু সংস্কৃত ভাষা শিক্ষালাভ করেই কবি ক্ষান্ত হননি। বিবিধ সংস্কৃত পুরাণ সম্বন্ধেও তিনি বিশদ জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। পরিবেশ ও বিষয়ের উপযোগিতা বিবেচনা করে কবি তাঁর অর্জিত জ্ঞান প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত স্থানে সংযোজিত করতে যে-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন, তাতেই তাঁর সম্পর্কে এ-মন্তব্যের সার্থকতা প্রমাণিত হয়। গ্রন্থে বর্ণিত 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী'-পুরাণের কাহিনীর মধ্যে অন্যবিধ পৌরাণিক প্রসঙ্গের সুনিপুণ প্রয়োগ, অবশ্যই তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে। যাতে মূল কাহিনীর গতি কিংবা প্লটবন্ধনে সামান্যতম শিথিলতা পরিলক্ষিত হয় না। এ-প্রসঙ্গে দেবী দুর্গার বাহন 'সিংহ'-প্রসঙ্গের অবতারণা উল্লেখ্য:

এতেক শুনিয়া তবে বোলেন শ্রীহরি।
অবশ্য ধরিব আমি সিংহমূর্ত্তি ধরি।।
এ বোলিয়া সিংহমূর্ত্তি ধরিলা নারায়ণ।
বক্র নখ দন্ত হৈল বিকট ভূষণ।।
শটাতে নক্ষত্রলোক করয়ে বিদার।
মহাপরাক্রম বীর কি কহিব আর।।
এহিমত ঐতি মূর্ত্তি করিলা প্রচার।
মৎস্যপুরাণে আছে ইহার বিস্তার।। (পৃ. ৭৪)

দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনার মধ্যে দুর্গার বাহনের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি মৎস্যপুরাণের কাহিনী এনে তা সুনিপুণ কৌশলে জুড়ে দিয়েছেন।

কবির কাব্যরচনার মূলে যশঃপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা যতটা ক্রিয়াশীল ছিল, তারও চেয়ে বেশি করে সক্রিয় ছিল তাঁর আন্তর তাগিদ। বাল্যকাল থেকেই মাতৃপিতৃহীন কবি নানাবিধ দুঃখে-কষ্টে জর্জরিত দুর্বিষহ জীবনে কোনো আশ্রয় বা অবলম্বন খুঁজে পাননি। এ-দুর্বিষহ যন্ত্রণা থেকে উদ্ধারের একমাত্র সহায় হিসেবে তাঁর সামনে ছিল দেবী চণ্ডীর শরণ-প্রার্থনা। তাই আত্মনিবেদনের ছলে তিনি দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। কবি কর্তৃক এ- মাহাত্ম্য বর্ণনায়ও গভীরভাবে স্বীকৃত ও অনুভূত হয়েছে দেবীর সহায়তার কথা।

ক. তাহাতে ভরসা মাত্র মনরূপ কালী।
তাহার ইচ্ছাতে যদি বর্ণিবারে পারি।।
কণ্ঠে থাকি ভগবতী যে কহিলা বাণী।
তাহা প্রকাশিলাম আমি অন্য নাহি জানি।। (পৃ. ১৫৪-৫৫)

খ. ভবানী প্রসাদ বলে করি পুটাঞ্জলি।
অন্তকালে পদছায়া দিবা মোরে কালী। (পৃ. ৫৯)

বাংলাদেশের কবি বাংলার সমাজ-জীবনের আচার-রীতি-সংস্কার বিস্মৃত হননি। তাই পুরাণকাহিনী বর্ণনার মধ্যেও বাঙালি জীবনচিত্রের অনিবার্য রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। স্বামিগৃহের দীর্ঘ পরবাসে কন্যার জন্য জননীর হা-হুতাশ, স্বামিগৃহ থেকে প্রত্যাগতা কন্যার প্রতি মায়ের স্নেহ-ভালবাসা ও আনন্দাশ্রু বিসর্জন, সর্বোপরি কন্যার মুখ থেকে 'মা' ডাক শোনার জন্য বাঙালি জননীর চিরন্তন আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষাকে উপস্থাপন করার কৃতিত্বে কবির সমাজ ও পারিপার্শ্বিক জীবন-সচেতনতা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।

ক. মেনকা বোলেন পুত্র শুন তার কথা।
গৌরী বিনে প্রাণ মোর কান্দে যে সর্ব্বদা।।
গৌরী সে আমার প্রাণ গৌরী সে জীবন।
গৌরী বিনে অন্ধকার দেখি এ ভুবন।।
কতকাল হতে আছে শিবের ভুবন।
না দেখি গৌরীর মুখ না রহে জীবন।। (পৃ. ২২)

খ. বহুদিনে দেখিলাম গৌরীর বদন।
নির্জ্জীব শরীরে যে সঞ্চারে জীবন।।
যে অবধি হরনিকেতনে গেলা চলি।
তদবধি আছি মাগো মা ডাকের কাঙ্গালি।।
পুন যদি দয়া করি আসিলা অভয়া।
জনম সফল কর ডাক মা বলিয়া।। (পৃ. ৩৭)

পুরাণ-নির্ভর চরিত্র হিমালয়, মৈনাক, শিব, মেনকা, গৌরীর দৈনন্দিন জীবন-চিত্র উপস্থাপনে কবি তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জীবন ও পারিপার্শ্বিকতা থেকে প্রচুর সহায়তা গ্রহণ করেছেন। এতে কাব্যের সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলো দেববৈশিষ্ট্যের গৌরবে মানুষ ও তাঁদের (দেবতাদের) অবস্থানের ব্যবধানগত নির্দিষ্ট সীমারেখা অক্ষুণ্ন রাখতে পারেননি। তাঁরা পুরোপুরি বাঙালি গৃহের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনায় নিত্যক্রিয়াশীল মানুষে রূপান্তরিত হয়েছেন। কন্যা অদর্শনে কাতর হিমালয় ও মেনকা, গৌরী-বিরহে স্বামী শিবের মনঃকষ্ট, স্বামীগৃহে সীমাহীন দারিদ্র্য ও পিতা-মাতা-ভ্রাতা অদর্শনে কাতরা গৌরীর আন্তরযন্ত্রণা যেন দারিদ্র্যক্লিষ্ট ও বিরহ-কাতর সাধারণ মানুষের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন কবি আপন অন্তরউৎসারিত অনুভবে দুঃখ-বিরহের এই চিত্র অঙ্কন করেছেন। তাই এ-বর্ণনা এতটা বাস্তবধর্মী ও আবেগময় হয়ে উঠেছে।

কেন গো জননী আছ নিদয়া হইয়া।
তনয়া বলিয়া কিছু নাহি মায়া দয়া।।
যত দুঃখ পাই আমি হরনিকেতন।
ক্ষুধায় না পাই অন্ন নাহিক বসন।।
বসন-ভূষণ বিনা হইয়াছি উলঙ্গ।
পিচাশ বেতাল ভূত দানাগণ সঙ্গ।।
রাজার নন্দিনী হইয়া এত দুঃখ পাই।
তৈলের অভাবে মা গো অঙ্গে মাখি ছাই।
বছর হইল গত হরনিকেতনে।
মা বিনে সন্তাপ দুঃখ জানে কোন্ জনে।। (পৃ. ১৯)

পুরাণ-কাহিনীর মধ্যেও 'বাঙালি কবি-সুলভ কবিত্ববলে' কবি পাঠকসমাজের 'রুচির পূর্ণতা সাধনে' সাফল্যলাভ করলেও, কাব্যবিষয়ে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে তাঁর মধ্যে যেন সীমাবদ্ধতা রয়েছে, এ-ধরনের সংশয়ে সবসময় ম্রিয়মাণ ছিলেন। তাই রচনাকর্মের স্থানে স্থানে বিনয় প্রকাশেও কবি কুণ্ঠাবোধ করেননি। এ-তাঁর আত্মসচেতন ও আত্মবিশ্লেষণ গুণসম্পন্ন মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ।

মোর দোষগুণ সবে না করিবে মনে।
প্রণতি করিয়ে আমি সবার চরণে।। (পৃ. ১৩৭)

তাঁর আবাল্য অন্ধতা ও নিরক্ষরতা কবির কাব্যের ভাষাকে দীনতা ও অর্বাচীনতার দায়ে অসংহত-অসঙ্গত বলে চিহ্নিত করতে পারেনি। বরং সামগ্রিক

বিচারে তাঁর কাব্যভাষা, সরল, পরিচ্ছন্ন ও ভক্তিমাধুর্যপূর্ণ। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'প্রাপ্তপুঁথির সন-তারিখে কারচুপি না থাকিলে তিনশত বছরের পূর্ববর্তী অন্ধকবি ময়মনসিংহে [আধুনিক টাঙ্গাইলে] বসিয়া পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষা দক্ষতার সঙ্গে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ... বীভৎস বর্ণনাতেও কবি রচনার গুণে ক্লাসিক সংযম রক্ষা করিতে পারিয়াছেন।'[২৫] তাছাড়াও সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রে পারদর্শী কবি ক্ষেত্রবিশেষে সংস্কৃত ভাষা ও অলঙ্কারের সমাবেশও ঘটিয়েছেন। রূপ- বর্ণনা প্রসঙ্গে মধ্যযুগীয় এই কাব্যরীতির প্রকাশ কাব্যের অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়। দেবী চণ্ডীর রূপবর্ণনা প্রসঙ্গ :

বদন-পূর্ণিমা-শশী কি মোহন আভা।
সহস্র বিদ্যুৎ জিনি শ্রীঅঙ্গের শোভা।।
তিলফুল জিনি নাশা রতন-বেশর।
চন্দ্র-সূর্য্য জিনি যেন জ্যোতি মনোহর।।
দর্শনে দামিনী জ্বলে ধনু জিনি ভুরু।
রামরম্ভা জিনি দুই সুকুমার উরু।।
গৃধিনী জিনিয়া দুই সুন্দর শ্রবণ।
কপালে অলকাবলী অতি সুশোভন।। (পৃ. ২৬৩)

বাংলাভাষী সাধারণ মানুষের কাছে পুরাণ-কথা উপস্থাপনই কবির মূল লক্ষ্য। তাই তিনি সহজ-সরল ভাষায় এবং ব্যাখ্যামূলক বর্ণনার মাধ্যমে অগ্রসর হয়েছেন অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে, কাব্যে কবির এ-ধরনের স্বীকারোক্তির সন্ধান মেলে। তবে ভাষা-ব্যবহারে কখনো-কখনো অর্বাচীনতার পরিচয়ও পরিদৃষ্ট হয়। কবির এ- কাব্য মূলত মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুসরণ। তাই কাব্যে মৌলিকতার পরিচয় উপস্থাপনের সুযোগ সব সময় অনুকূলে ছিল না। বিবিধ প্রতিকূলতার জন্যই কবি কখনো কখনো লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়েছেন। তাই কাব্য-ভাষায় দীনতার প্রকাশও অনেক সময়ে অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

রাজারাণী দুই জনে লোটায়ে ভূমিতল।
হেনকালে আইলা তথা মৈনাক শিখর।।
দেখি ভূমিতলে পড়ি আছে জনক-জননী।
মৈনাক পুছেন কথা যোড় করি পাণি।।
কি কারণে দুই জনে পড়ি আছ ভূমিতলে।
কিসের অভাব তব সংসার ভিতরে।। (পৃ. ২১)

তবে ভাষারীতির সামগ্রিক বিচারে অপরিপক্কতার পরিচয় ব্যাপক নয়। অধিকন্তু বলা যায়: বিষয়ের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বিবৃতিমূলক বর্ণনায় 'দুর্গামঙ্গল'-এর ভাষা দীনতাব্যঞ্জক তো নয়ই, বরং যথোপযুক্তই হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, কবির ব্যবহৃত ভাষায় আধুনিকতার ছাপও যথেষ্ট।

মধ্যযুগীয় সাহিত্যে বহুল ব্যবহৃত পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দই ব্যবহৃত হয়েছে 'দুর্গামঙ্গল'- কাব্যে। তবে ব্যবহৃত ছন্দ মাত্রাবিচারে সর্বদা ত্রুটিমুক্ত নয়। এ-দুই ছন্দে রচিত এ- কাব্য যে গীত হওয়ার উদ্দেশ্যেই রচিত, তার প্রমাণ মেলে কাব্যে উল্লিখিত কবির বক্তব্যে।

ক. যেবা পড়ে যেবা শুনে ভবানীমঙ্গল।
সর্ব্বাধর্ম নাশ হয় অন্তেতে কুশল।। (পৃ. ২৯৩)

খ. হাতে তাল বাঁধিয়া ভবানীগুণ গায়।
অন্তকালে সেহি লোক কৈলাসেতে যায়।। (পৃ. ২৯৪)

গ. যাহার ভবনে গায় ভবানীমঙ্গল।
স্থির লক্ষ্মী সদা থাকে সর্ব্বত্র কুশল।। (পৃ. ২৯৩)

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে বিশেষ পরিচয়ে (অর্থাৎ 'জন্মান্ধ কবি'-রূপে) পরিচিত এবং আত্মীয়-পরিজন কর্তৃক নিগৃহীত কবি ভবানীপ্রসাদ রায় বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন কি-না, কিংবা তাঁর কোনো সন্তান-সন্ততি ছিল কি-না, তাঁর কাব্য পাঠ করে সে-বিষয়ে কোনো তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। আজীবন বন্ধু- পরিজনহীন কবি দুঃখ- জর্জরিত জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রে বা পর্যায়ে একান্ত সঙ্গী হিসেবে কাউকে লাভ করলে, কাব্যে তার উল্লেখ না করে পারতেন না, এ-ধারণা করা যায়। তবে-

ভবানীপ্রসাদ রায় ভাবিয়া ব্যাকুল।
চক্ষুহীন কৈলা বিধি নাহি পাই কুল।। (পৃ. ১৫৪)

যে-কবি তাঁর অন্ধজীবনের অসহায়ত্বে বেদনার্ত, নির্ঝঞ্ঝাট ও স্বস্তিদায়ক একটু আশ্রয়ের কাঙাল, ব্যক্তিজীবনের নানাবিধ টানাপোড়েন এবং সীমাবদ্ধতা ও দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন, সেই কবির কাছ থেকে এতবড় (বিষয় ও আকারগত দিক থেকে) একটি গ্রন্থপ্রাপ্তি নিঃসন্দেহে বিস্ময়ের ব্যাপার। তিনি শুধু টাঙ্গাইলবাসীর

গৌরব নন, বাংলা ভাষাভাষী প্রতিটি মানুষেরই অহংকার। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি সত্যই বিরল ও ব্যতিক্রমী কবিসত্তা।

পাঁচ : রূপনারায়ণ ঘোষ

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে টাঙ্গাইলবাসী এমন অনেক প্রাচীন কবির সন্ধান পাওয়া যায়, যাঁদের রচনাকর্ম সম্পাদিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না হলেও, রচনাকর্মের সম্পূর্ণ বা খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। এসব কবিদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন রূপনারায়ণ ঘোষ। কবি রূপনারায়ণ ঘোষ প্রাচীন আটিয়া পরগনার (আধুনিক টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর ও বাশাইল থানার) অন্তর্গত আদাজান-আদাবাড়ী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। মধ্যযুগীয় সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ধারা মঙ্গলকাব্যের দুই বিশেষ শাখা তাঁর পদচারণায় ধন্য হয়েছিল। ষোল শতকের শেষের দিকে এই কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে ধারণা করা হয়। কাব্যে ব্যবহৃত পুরানো শব্দের ব্যবহারও তাঁর প্রাচীনত্বের পক্ষে সমর্থন যোগায়। তাঁর পিতার নাম জগন্নাথ ঘোষ।[২৬] তাঁদের পারিবারিক উপাধি 'ঘোষ'। 'দুর্গামঙ্গল' বা 'প্রাকৃত চণ্ডী'- কাব্য রচনার মাধ্যমে তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন। কাব্যমধ্যে কবির আত্মপরিচয় উদ্‌ঘাটনের মতো বিস্তারিত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে টাঙ্গাইলের সন্তোষের জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় নীলকান্ত বসু লিখিত কুলজিগ্রন্থ 'কায়স্থ বংশাবলী'-র মাধ্যমে কবির আত্মপরিচয়ের সামান্য সন্ধান মেলে। বর্তমান বাশাইল ও মির্জাপুর থানার আদাজান-আদাবাড়ী এবং আড়রা গ্রামের ঘোষ পরিবার কবি রূপনারায়ণ ঘোষের উত্তরপুরুষের দাবীদার।[২৭]

প্রাপ্ত 'দুর্গামঙ্গল'- পুথিতে[২৭ক] রচনাকাল সংক্রান্ত তথ্যের অনুপস্থিতি কবির আবির্ভাবকাল সম্বন্ধেও সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। তবু রূপনারায়ণ ঘোষকে পাঠক সমাজের কাছে পরিচায়িত করেন যিনি, সেই রসিকচন্দ্র বসু তাঁর 'দুর্গামঙ্গল ও কবি রূপনারায়ণ'[২৮] -শীর্ষক প্রবন্ধে কবিকে ষোল শতকের বলেই উল্লেখ করেছেন। 'বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার, টাঙ্গাইল'-এ উল্লিখিত তথ্যের সূত্র ধরে বলা যায়, কবি রূপনারায়ণ ১৫৯৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অন্যদিকে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে সতেরো শতকের মধ্যভাগের কবি হিসেবে ধারণা পোষণ করেন।[২৯] কিন্তু অন্য একটি সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এই ধারণা সমর্থন করা যায় না। টাঙ্গাইলের ষোল শতকের কবি শ্রীরায় বিনোদ প্রণীত 'পদ্মাপুরাণ'- কাব্যের সম্পাদক ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া বিনোদকাব্যের যে, পাঁচটি পুথি ব্যবহার করেছেন, সেগুলোর মধ্যে একটি পুথি বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ম (রাজশাহী)-এর। এ- পুথিতে রচয়িতার সর্বমোট নয়টি ভণিতা আছে।

ভণিতাগুলোর প্রথমটিই কবি রূপনারায়ণের। বাকি আটটি ভণিতা শ্রীরায় বিনোদের। ধারণা করা হয় যে রূপনারায়ণ-এর ভণিতাযুক্ত এই কাব্যাংশটুকু শ্রীরায় বিনোদের কাব্যের মূলপাঠের সঙ্গে মিশে গেছে। সম্পাদকের মতে, "এই রূপনারায়ণ সম্ভবত পূর্বতন কোনো স্বনামখ্যাত মনসা-কবি।" এ-তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রসিকচন্দ্র বসুর একটি মন্তব্যও গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিসঙ্গত বলে ধরে নেওয়া যায়। রসিকচন্দ্র বসুর মতে, রূপনারায়ণ ঘোষ ষোল শতকেরই কবি। স্মতর্ব্য যে বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়মে প্রাপ্ত শ্রীরায় বিনোদের পুথি থেকে কবি রূপনারায়ণের একটি সম্পূর্ণ কবিতা উদ্ধার করেছেন সম্পাদক।

। লাচাড়ী। ধানশী রাগেন গীয়তে।

মা মনসে কৃপার সাগর তুমি।
তুমি কৃপা কর জারে সেই সে ভকতি করে
কিবা স্তুতি করিতে পারি আমি।।
ব্রহ্মা হর নারায়ণ আর জথ দেবগণ
সেবএ স্তবএ ধ্যানমনে।
কৃপা করহ মোরে রাখহ জে পদতলে
পূজম ভকতি বিধানে।।
লক্ষ্মীরূপে উমা নাম কে তোমার সমান
সুর নর জথ বিদ্যাধরী।
তুমি দেবী বিষকায়া কে বুঝে তোমার মায়া
ত্রিভূবনে জয় বিষহরী।।
স্বর্গে পূজে দেবগণ পাতালেতে নাগগণ
মর্ত্যে পূজে জথ নরলোকে।
মুঞি পূজিতে চাহম মা যদি মুঞি বর পাম
কৃপা করি বোলহ আমাকে।।
তুমি দেবী পদ্মাবতী তোমা পরে নাহি গতি
তুমি যদি কর অঙ্গীকার।
ব্রহ্মাণীর বিজয় রূপনারায়ণে কহে
নারী সবে দিল জয়কার।।

রূপনারায়ণ যে শুধু 'দুর্গামঙ্গল'- কাব্যেরই কবি নন, মনসামঙ্গলেরও কবি এবং তিনি 'ব্রহ্মাণী-বিজয়'- নামে একটি সম্পূর্ণ মনসামঙ্গল রচনা করেছিলেন, উপরিউদ্ধৃত কবিতায় তার প্রমাণ রয়েছে। 'রূপনারায়ণের মনসাঙ্গলের নাম ছিল সম্ভবত 'ব্রহ্মাণী-বিজয়'। 'ব্রহ্মাণী' মনসার অন্যতম মুখ্য নাম। বিপ্রদাস ও শ্রীরায় বিনোদের মনসামঙ্গলে এ-নামের ব্যবহার রয়েছে। রূপনারায়ণের এ-কবিতায় মনসার আরও যেসব নাম ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে : বিষহরী, পদ্মাবতী ও ব্রহ্মাণী। কবিতা- শীর্ষে 'ধানশী রাগ'-এর উল্লেখ থাকায় প্রমাণিত হচ্ছে : রূপনারায়ণের সঙ্গীত বিষয়েও প্রয়োজনীয় জ্ঞান ছিল'।[৩০]

কবি রূপনারায়ণ ঘোষের 'দুর্গামঙ্গল'- অনুবাদমূলক রচনা। সংস্কৃত মার্কণ্ডেয় পুরাণ অবলম্বনে এ-গ্রন্থ রচিত। তবে গ্রন্থটি আক্ষরিক অনুবাদ নয়। সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ বাংলা ভাষাভাষী মানুষের প্রতি লক্ষ্য রেখেই কবি এ-গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাই কাব্যটি পাঁচালীর রীতিতে রচিত এবং স্বাভাবিকভাবেই এতে বিভিন্ন রাগ-রাগিণী প্রযুক্ত হয়েছে। কবি রূপনারায়ণ ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। সংস্কৃত সাহিত্যে তিনি প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তিনি যে সংস্কৃত কবি কালিদাসের 'রঘুবংশ'-ও অধ্যয়ন করেছিলেন, তাঁর 'দুর্গামঙ্গল' পুথি পাঠ করে সে- বিষয়ে অবগত হওয়া যায়। কবির 'দুর্গামঙ্গল'- কাব্যের শুরুতেই কবি কালিদাসের 'মন্দঃ কবিযশপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাসাতাম্'-শ্লোকের অনুবাদ প্রযুক্ত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় কবির বিশেষ অধিকার ছিল বলেই তাঁর কাব্যে প্রসিদ্ধ সংস্কৃত শ্লোকের উল্লেখ করেছেন। এগুলোর উল্লেখস্থলে তাঁর নৈপুণ্য ও পারদর্শিতার যথার্থ পরিচয় মেলে। তবে সংস্কৃত পুরাণের কাহিনী অনুবাদ করতে গিয়ে কবি একে সর্বসাধারণের বোধগম্য করার লক্ষ্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন। আর তাই অনুবাদকর্মে কবিকে মাঝে মাঝেই বিস্তৃত বর্ণনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। এতে স্বাভাবিকভাবেই মূল বর্ণনার চেয়ে অনুবাদকর্ম অধিকতর ব্যাখ্যাধর্মী হয়ে উঠেছে। পাঠক-শ্রোতার অবস্থান বিবেচনা করে তাঁর এ-ধরনের প্রয়াস অবলম্বন কাব্যসৌন্দর্যবর্ধনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সহায়ক হয়নি সত্য, তবে এই প্রয়াস কবির মূল উদ্দেশ্যসাধনে কবিকে সফলকাম করে তুলেছিল—একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

কবি রূপনারায়ণের সমসময়ে বাংলা ভাষা এ-অঞ্চলের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতসমাজে অপভাষা হিসেবে গণ্য হতো। তেরো শতকে মুসলমান শাসকদের আগমনে এদেশীয় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বাংলাভাষা ও সাহিত্যবিরোধী নিষেধবাণীর[৩১] নিগড় থেকে বাংলা ভাষা উদ্ধার পেলেও রূপনারায়ণের সমসময়ে তাঁর অঞ্চলে তখনও সংস্কৃতের দৈব- আসনে ধাক্কা লাগেনি। কবির গ্রন্থের প্রারম্ভেই এর প্রমাণ রয়েছে।

তাহান চরিত্র কিছু কহিতে করি আশা।
শ্লেষ না করিহ ভাই বলি অপভাষা।।

বাংলা ভাষায় দুর্গার মাহাত্ম্যকথা বর্ণনা করতে তাই কবি এ- ধরনের অনুরোধবাণী উচ্চারণ না করে পারেননি। তবে পণ্ডিতসমাজ-নিন্দিত বাংলা ভাষায় বা অন্য যে-কোনো ভাষায়ই ধর্মকথা রচিত হোক না কেন, তাতে ধর্মের অমর্যাদা হতে পারে, এ- কথা কবি স্বীকার করেননি।

চণ্ডাল ভাণ্ডারে যদি থাকে গঙ্গাজল।
তথাপি পবিত্র বড় জানিহ নিশ্চল।।

শুধু মধ্যযুগের অনুবাদক কবি হিসেবেই নয়, ওই সময়ে উচ্চসমাজে নিন্দিত ভাষাকে সাহিত্যের বাহন করার ক্ষেত্রেও তাঁর যে প্রচেষ্টা, তা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

পৌরাণিক কাহিনীভিত্তিক 'দুর্গামঙ্গল'- রচনায় কবির প্রধান অবলম্বন 'দুর্গাসপ্ত শতী'র আখ্যান। এ-অনুবাদে কখনো মূলগ্রন্থ থেকে ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে, কখনো বা সংস্কৃত মূলশ্লোকের অবিকল বাংলা রূপান্তর পরিবেশিত হয়েছে। তাছাড়া পুরাণবহির্ভূতকাহিনী-যে ঘটনার অনুষঙ্গে খুব কম প্রযুক্ত হয়েছে, তা বলা যায় না। কেননা সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ বাংলাভাষী সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় পুরাণকাহিনীকে বিষয়, ভাষা ও রচনারীতির দিক থেকে বোধগম্য করার জন্যই কবির সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়োজিত ছিল। সেহেতু কবিকে পাঠক- শ্রোতার গ্রহণ ও ধারণ-ক্ষমতার কথা চিন্তা করে একটি নির্দিষ্ট সীমাপথে অগ্রসর হতে হয়েছে। তাই সাধারণ জনসমাজে জনপ্রিয় ও প্রচলিত লৌকিককাহিনীর ব্যবহার অনিবার্যভাবেই রচনাকর্মে প্রযুক্ত হয়েছে। সর্বোপরি এ- মন্তব্য করা যায় যে তাঁর 'দুর্গামঙ্গল' রচনারীতি ও ভাষা-অলঙ্কারের দিক থেকে সমসময়ের অনেক কবির রচনাকর্মের চেয়ে উন্নততর। তাঁর কাব্যে, প্রচলিত ছন্দ ব্যবহারের বাইরেও, বৈচিত্র্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছন্দোগত নতুনত্ব আনার প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

কৌমোদকী চারুচক্র
মোহে বৈরী নাশে দক্ষ
অসংখ্য বিপক্ষে কক্ষ
সর্বভক্ষ ঈক্ষিণী।
ইন্দ্রচন্দ্র দেববৃন্দ
পূজতি পদারবিন্দ

বাহন মৃগেন্দ্র ইন্দ্র
ব্রহ্মবন্দ্য বন্দিনী।।

ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাচীন বাংলা শব্দের উপস্থিতি লক্ষ করা গেলেও, এ-কাব্যে আধুনিক শব্দের ব্যবহার কম নয়। বরং কাব্যের প্রাচীনত্বের তুলনামূলক বিবেচনায় আধুনিক শব্দের ব্যবহার এ-কাব্যে সুপ্রচুর। সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষাতেই অভিজ্ঞ ছিলেন। কবি রূপনারায়ণ ঘোষ আর তাঁর 'দুর্গামঙ্গল' ও 'ব্রহ্মাণী-বিজয়' টাঙ্গাইল জেলার প্রাচীন সাহিত্যের ঐতিহ্যবৃদ্ধির দ্বার উন্মোচিত করেছে।

ছয় : শ্রীরামলোচন দাস

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের এক বিরাট অংশ জুড়ে অনুবাদ সাহিত্যের স্থান। এ-অনুবাদ-সাহিত্যধারার যাত্রা শুরু হয় পনেরো শতকে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের প্রথম অনুবাদক কবি কৃত্তিবাস ওঝার সাহিত্যচর্চার সূত্র ধরে। বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত 'রামায়ণ' কৃত্তিবাস কর্তৃক বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়ার মাধ্যমে এ-যুগান্তকারী অভিযাত্রা। শুধু রামায়ণই নয়, সংস্কৃত সাহিত্যের সমৃদ্ধভাণ্ডার থেকে মহাভারত, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণকাহিনী নির্ভর ধর্মকথা ও শাস্ত্রকথা, বাংলায় অনূদিত হয়ে আসছে। এসব গ্রন্থের অনুবাদ বাঙালি চিত্তকে যুগ যুগ ধরে বিমুগ্ধ করেছে। একথা সত্য যে ইতঃপূর্বে এসব মূল সংস্কৃত গ্রন্থ ছিল অভিজাত ব্রাহ্মণশ্রেণীর নিজস্ব সম্পদ। উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-সৃষ্ট মিথ্যে ধর্মীয় ঐতিহ্য-গর্বের গণ্ডি পেরিয়ে কালক্রমে এসব বিষয়কেই সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ সাধারণ মানুষের বোধের জগতে পরিব্যাপ্ত করার লক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। সংস্কৃত ভাষার আবরণ মুক্ত করে এসব মূলকাব্য বাংলা ভাষায় রূপায়ণের প্রচেষ্টায় ব্রতী হন বাংলা ভাষা-ভাষী কবিরা। বিখ্যাত কবি মালাধর বসু, কাশীরাম দাস প্রমুখ কবি এ-ধরনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই অগ্রসর হয়েছেন এবং এ-ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন নিজেদের প্রতিভায় ও কৃতিত্বে। এ-ধারারই আর এক কবি শ্রীরামলোচন দাস।

শ্রীরামলোচন দাস প্রাচীন কাগমারি পরগনার (আধুনিক টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী থানার) তেরখি (বা টেরকি) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মকাল পৌষ, ১১৯৮ বঙ্গাব্দ (১৭৯২ খ্রি:)। কবি ছিলেন বৈদ্য সম্প্রদায়ভুক্ত নয়দাস বংশের লোক। টেরকি গ্রামের এই বৈদ্য নয়দাস বংশের ইতিহাস বেশ পুরানো। পূর্বাপর এই বংশ সম্ভ্রান্ত বংশ হিসেবেও পরিচিত। 'প্রেমলহরী', ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ,' 'শ্রীকল্কিপুরাণ,' 'সঙ্গীত রসোত্তর,' 'সঙ্গীতামৃতসিন্ধু'-প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা কবি শ্রীরামলোচন দাস যেমন এ-বংশের সন্তান, তেমনি আরও অনেক খ্যাতনামা ও

কীর্তিমান পুরুষের জন্মগৌরবে ধন্য ও গৌরবান্বিত এই বংশ।[৩২] এই বংশের সদস্যগণ ছাড়াও কবির গ্রামের সকলেই বিদ্যায়-ধনে-দানে-ধর্মে-কর্মে ও দয়ায় ছিলেন শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। কবির 'ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ' ও 'শ্রীকল্কিপুরাণ'- গ্রন্থে গ্রন্থকারের পরিচয়-অংশ থেকে তাঁর ব্যক্তিজীবনের বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়।

পরগণা ভারি নাম কাগমারি
অন্তঃপাতী তারি গ্রাম।
খ্যাতি ক্ষিতিতলে সর্ব্বলোকে বলে
তেরখি তাহার নাম।।
নগর সুন্দর অতি মনোহর
নদীকুলে শোভা পায়।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নানা গুণান্বিত
বসতি বিস্তর তায়।।
সর্ব্ব জাতি বাস পরম উল্লাস
শোভে বহু তরুবর।
অতি শোভাকর দেখিতে সুন্দর
শান্তশীল নারীনর।।
বৈদ্যকুলজাত ভুবন বিখ্যাত
সাক্ষাৎ শিব সমান।
নাম কৃষ্ণকান্ত সুশীল সুশান্ত
সর্ব্বত্র গুণ বাখান।।
তাঁহার নন্দন অতি কুভাজন
শ্রীরামলোচন দাস।। (কল্কিপুরাণ, পৃ. ৫)

কবি তাঁর আত্মপরিচয় উত্থাপন প্রসঙ্গে গাছ-পালাবেষ্টিত নদী তীরবর্তী নিজগ্রাম মনোহর টেরকি-র বর্ণনা প্রদান করেছেন: যে গ্রামে বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান ছিল। এই গ্রামেরই নয়দাস বংশের কীর্তিমান, দানশীল ও বিখ্যাত পুরুষ কৃষ্ণকান্ত দাস, যিনি কবি রামলোচন দাসের পিতা। 'শ্রীকল্কিপুরাণ'-গ্রন্থের পূর্বে রচিত 'ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ'-গ্রন্থের প্রারম্ভেও কবির 'আত্মপরিচয়' সন্নিবেশিত হয়েছে।

বিশ্বতে ব্যাপক পরগণে কাগমারি।
তেরখি নামেতে গ্রাম অধীন তাহারি।।
নদী তীরে এ নগরে বসতি প্রচুর।
মিশ্রিত ইহাতে গ্রাম সহদেবপুর।।
ব্রহ্মাণ্ডের ব্রাহ্মণ সকল এইস্থানে।
বিদ্যা ধর্ম্মে পুণ্য কর্ম্মে সর্ব্বত্র বাখানে।।
নানা জাতি বাস করে এইতো নগরে।
স্ব স্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম মর্ম্ম সকলে আচরে।।
অম্বষ্ঠ জাতির শ্রেষ্ঠ গরিষ্ঠ আখ্যাত।
এ গ্রামে নিবাস নয়দাস সুবিখ্যাত।।
কবিকণ্ঠহার করি কৃপা সুপ্রকাশ।
কুলে কৈলা মর্য্যাদক এই নয়দাস।।
সেই বংশে শিব-অংশে আবির্ভাব হন।
যশো-সরোবরে ফুল্ল-কমল যেমন।।
গুণেতে তাঁহার নাম সর্ব্বত্র বিকাশ।
পুণ্যকীর্ত্তিমন্ত শান্ত কৃষ্ণকান্ত দাস।।
তাঁহার তনয় অতি ঘোর মূর্খজন।
সর্ব্ব-সাধারণে বলে শ্রীরামলোচন।। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

শুধু নিজের পিতার কিংবা টেরকি গ্রামের বর্ণনার মধ্যেই কবি তাঁর পরিচয় সীমাবদ্ধ রাখেননি। 'ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ'-থেকে কবির পিতামহ বংশীয় ও মাতামহ বংশীয় নানাবিধ বিস্তারিত তথ্যও অবগত হওয়া যায়। তাঁর পিতামহ ছিলেন কৃষ্ণকেশব দাস এবং প্রপিতামহ রামশরণ দাস।

মম নিজ পরিচয় জনকের নাম।
পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি যথাধাম।।
বিশিষ্ট রূপেতে আর বলি পরিচয়।
অবধান কর সব শ্রোতা মহাশয়।।
রামশরণ দাস শ্রীরাম তুল্য জন।
আমার প্রপিতামহ সেই শান্ত হন।।

পিতামহ নাম কৃষ্ণকেশব প্রচার।
যোগ জ্ঞানে তপে শীলে মুনির আচার।। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

কবির মাতামহ রামহরি সেন ছিলেন নবগ্রামের অধিবাসী। প্রমাতামহের নাম রামভদ্র সেন। কবির বৃদ্ধ প্রমাতামহের নাম শ্রীকৃষ্ণ সেন— ধর্মশীল, পুণ্যবান, খ্যাতনামা ব্যক্তি হিসেবে ছিল যাঁর ব্যাপক পরিচিতি। কবি রামলোচন দাসের মাতার নাম ছিল যমুনা।

নবগ্রাম বাস রামভদ্র সেন নাম।
দুর্গাভক্ত মহাশাক্ত অতি গুণধাম।।
আমার বৃদ্ধ প্রমাতামহাশয়।
তপেতে ছিলেন তিনি অতি তেজোময়।।
প্রমাতামহ শ্রীকৃষ্ণ যেন কৃষ্ণ সম।
সত্ত্বগুণাবলম্বনে না ছিল উপম।।
মাতামহ রামহরি সেন সবে জানে।
শক্তি গোত্র গুণময় সর্ব্বত্র বাখানে।।
ঈশ্বর সমান তাঁর সব ব্যবহার।
তাঁহার তনয় হয় জননী আমার।।
জননী যমুনা নাম্নী সর্ব্বগুণোত্তমা।
মহালক্ষ্মী দুর্গাতুল্য অন্যে কি উপমা।। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

বিবিধগুণে গুণান্বিত কবি রামলোচন দাসের পিতা কৃষ্ণকান্ত দাসের জনদরদী হিসেবে প্রচুর সুনাম ছিল। উৎসাহ ও সহায়তা দানের মাধ্যমে তিনি বহু বিদ্যার্থীকে আনুকূল্য প্রদর্শন করেছেন। তাঁর প্রদত্ত অর্থে অনেক গরীবের লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহ হতো। দুঃস্থ ও আশ্রয়হীনা অনেক বৃদ্ধা ও বিধবার সাহায্যার্থেও তিনি অর্থ ব্যয় করতেন। তিনি ছিলেন রাজশাহীর দুবলহাটির জমিদারের সম্মানিত কর্মচারী। জমিদারী এস্টেটের কর্মচারী হিসেবে চাকরির সুবাদেই তার পরিচিতি লাভের সুযোগ হয়েছিল বহু দুঃস্থ, নিঃস্ব ও দরিদ্র মানুষের সঙ্গে। নিবেদিতপ্রাণ কর্মীপুরুষ হিসেবে তিনি এসব মানুষের নানা সমস্যা নিরসনে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন।

বাল্যকাল থেকেই শিক্ষার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল রামলোচন দাসের। এই অনুরাগই পরবর্তী কালে বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর প্রভূত পাণ্ডিত্য অর্জনে তাঁকে সহায়তা করেছিল। কিশোর বয়সেই কবি তাঁর পিতৃব্য রামমাণিক্য দাসের

সঙ্গে নাটোরে অবস্থান করতেন। উদ্দেশ্য বাংলা ও ফারসি ভাষা অধ্যয়ন। তখন নাটোর ছিল বিখ্যাত রাণী ভবানীর রাজধানী। পরে কবি চলে আসেন ঢাকায়। এখানে তিনি তাঁর মামা রামজয় রায়ের সঙ্গে অবস্থান করে ফারসি ভাষা অধ্যয়ন করতে থাকেন এবং একসময় এ-ভাষাতে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এরপরেও রামলোচনের জ্ঞানপিপাসু মন সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধেও আগ্রহী হয়ে ওঠে। এজন্যে তিনি ঢাকা পরিত্যাগ করে পুনরায় নাটোরে চলে যান। সেখানে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। এ-ভাষা শিক্ষায় তাঁর শিক্ষক ছিলেন পণ্ডিত শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য। আন্তরিক নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত ভাষায়ও বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন। শুধু বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যে পাণ্ডিত্য অর্জন করেই রামলোচনের জ্ঞানপিপাসু মন পরিতৃপ্ত হয়নি। লেখাপড়ার পাশাপাশি একই সময়ে তিনি অর্জন করেন প্রতিমানির্মাণের কলাকৌশল ও চিত্রশিল্পগত দক্ষতা। সুতরাং কবি রামলোচনের পদচারণায় মুখরিত ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতির বিবিধ ক্ষেত্র।

শিক্ষাজীবন শেষে বর্বাকপুর জমিদার এস্টেটের মুন্সীগিরির চাকরির মাধ্যমে রামলোচন দাসের কর্মজীবনের শুরু। এ-পদে কিছুকাল অধিষ্ঠিত থাকার পর তিনি দিনাজপুরে পণ্ডিত আদালতের সেরেস্তাদার পদে নিয়োগ লাভ করেন। পরে তিনি ফৌজদারী আদালতের হেডমোহরের পদে নিযুক্ত হন। দীর্ঘকাল এ পদে আসীন থেকেই বৃদ্ধ বয়সে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। কবি রামলোচনের সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত মূলত তাঁর পিতার প্রেরণা ও উৎসাহে। তাঁর রচিত ভক্তিমূলক গান শুনে পিতা কৃষ্ণকান্ত সেন তাঁকে এতদ্বিষয়ক সঙ্গীতরচনায় উৎসাহ দান করেন। পিতৃআজ্ঞায় ও প্রেরণায় তিনি সঙ্গীতরচনায় মনোনিবেশ করেন। পরে তাঁর রচিত ভক্তিমূলক সঙ্গীত নিয়ে 'প্রেমলহরী' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। দিনাজপুরে অবস্থানকালেই তিনি বাংলা ভাষায় সংস্কৃত 'ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ'- অনুবাদ করেন। এ-অনুবাদকর্মে তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্য ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থটি পাঠক সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি লাভ করেন 'কবিরত্ন' উপাধি। 'ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ'-রচনার মাধমে কবি যে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিলেন, কবির 'শ্রীকল্কিপুরাণ'-গ্রন্থের 'দিনাজপুরের রাজবাড়ী বর্ণন'-অংশে তার সমর্থন সুস্পষ্ট। দিনাজপুরের জমিদার মহারাজ তারকনাথ রায়বাহাদুর পণ্ডিত হরনাথ চূড়ামণির কাছে 'কল্কিপুরাণ' শ্রবণ করেন এবং সর্বসাধারণের কাছে কল্কিপুরাণের মাহাত্ম্য-কথা প্রকাশ ও প্রচারের আশায় 'কল্পিপুরাণ'-বাংলায় অনুবাদ করানোর ইচ্ছে পোষণ করেন। কিন্তু এ-বিষয়ে যোগ্য রচয়িতার বা অনুবাদকের অভাব দেখে তিনি চিন্তিত হন। তবে তাঁর সভাসদ্‌বর্গ এ-গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য 'ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ'-এর বিখ্যাত কবি রামলোচনের নাম প্রস্তাব করেন।

নিতান্ত লালসা মনে হইল রাজার।
এ গুপ্ত পুরাণ কথা ভাষা করিবার।।
তবে সে প্রকাশ হবে শুনিবে সকলে।
কিরূপে হইবে ভাষা মহীপাল বলে।।
বিনা ভাষা প্রকাশের হেতু অন্য নাই।
ভাষা করে যোগ্য জন দেখিতে না পাই।।
সভাসদ সবে কন হইয়া হরিষ।
ইহার উপায় আছে শুন অবনীশ।।
শ্রীরামলোচন দাস বৈদ্যকুল জাত।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের ভাষা করিছে বিখ্যাত।।
ইথে কবিরত্ন নাম হয়েছে তাঁহার।
তাঁর প্রতি দেও রাজা এ কর্ম্মের ভার।।
শুনি আনন্দিত মন হইল রাজার।
চলিলা শ্রীকান্তকে করিতে প্রণাম।।...
এ দীনেরে মহারাজা করিলা স্মরণ।
শ্রুতমাত্র গেল মহীপালের সদন।।
এ অধীন হেরি রাজা হরিষ হইলা।
কল্কিপুরাণের ভাষা হেতু আজ্ঞা দিলা।।
রাজ আজ্ঞা শিরে ধরি শ্রীরামলোচন।
করিল কল্কিপুরাণ ভাষা বিবরণ।। (পৃ. ৮)

শ্রীরামলোচন দাস তারকনাথ রায়ের আদেশে শ্রীকল্কিপুরাণ অনুবাদ করেন।[৩৩] গ্রন্থে 'গ্রন্থকারের পরিচয়'-অংশে এর যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

এ অধম প্রতি দিলা অনুমতি
ভূপতি তারকনাথ। (পৃ. ৫)

কিংবা, শ্রীরামলোচন দাস কল্কিগুণ গায়।
আজ্ঞা দিল মহীপ তারকনাথ রায়।। (পৃ. ১৭)

কবি যে মহারাজের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা লাভ করেছিলেন, তা তাঁর কাব্যে রাজা, রাণী, রাজবাড়ী, রাজার পূর্বপুরুষ—প্রসঙ্গে বিস্তৃত প্রশস্তিবর্ণনা থেকেই ধারণা করা যায়। রাজা তারকনাথ ও রাণী শ্যামমোহিনীকে বিবিধ গুণ ও রূপসৌন্দর্যের আধার ও প্রজাবৎসল হিসেবে চিত্রিত করেছেন কবি। এছাড়া রামলোচন 'দিনাজপুরের রাজবাড়ী বর্ণন'-অংশে পৃষ্ঠপোষক তারকনাথের পূর্বপুরুষদের পুরুষানুক্রমিক পরিচয়ও উল্লেখ করেছেন।

ধামে অধিপতি পূর্ব্বে আছিলেন ভূপ।
প্রাণনাথ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের স্বরূপ।।...
তাঁহার তনয় রামনাথ মহীপাল।
নলতূল্য শান্তদান্ত একান্ত দয়াল।।
তৎসুত মহীপ ছিলা বৈদ্যনাথ মহামতি।
রাজধর্ম্মে ধার্ম্মিক দ্বিতীয় স্বর্গপতি।।
তাঁহার তনয় হন রাধানাথ ভূপ।
দানেতে বিখ্যাত হরিশ্চন্দ্রের স্বরূপ।।
রাজা রাধানাথের নন্দন সুভাজন।
গোবিন্দনাথ মহীপ প্রতাপে রাবণ।।
শ্রীল শ্রীতারকনাথ তাঁহার নন্দন।
ভূমিপতি মহামতি গুণের ভাজন।। (পৃ.)

তারকনাথ রায়ের গুণমুগ্ধ কবি রাজপরিবারের প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ। প্রিয়মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই 'রাজবাড়ীর রূপ ও ঐশ্বর্য বর্ণনা'য় কবির হৃদয়ের মাধুরী মিশানো সৌন্দর্যের ছোঁয়া লেগেছে।

অতি উচ্চ অট্টালিকা প্রাসাদ বিস্তর।
ধর্ম্মদ্বার বান্ধা তার কপাট প্রস্তর।।
বাজিছে নবদ ঘড়ি তুরি ভেরী আর।
দ্বারপাল কতশত রক্ষা করে দ্বার।।
চারিদিগে সরোবর প্রাচীর বেষ্টন।
পুষ্পোদ্যান স্থানে স্থানে অতি সুশোভন।।...
মাতঙ্গ তুরঙ্গ বহু বিদ্যমান।
কুঞ্জরের মধ্যে এক করীন্দ্র প্রধান।।

নামেতে ভৈরব গজ অত্যুচ্চ প্রবীণ।
সুমেরুর শৃঙ্গভঙ্গ গজ দেখি পীন।।
ভগদত্ত দত্ত এ যোজন পদ-করি।
কিম্বা দিলা ঐরাবত ইন্দ্র যত্ন করি।।
বাণের ধনেতে পূর্ণ কতেক ভাণ্ডার।
এ ধামের তুল্য নহে ভুবন মাঝার।। (পৃ. ৬)

কবি রামলোচন দাস গায়ক হিসেবে ততটা কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি। তবে পঁচিশ বছর বয়সে সঙ্গীত রচনায় তাঁর যে হাতেখড়ি, তা তাঁর অন্তর-উৎসারিত বোধেরই বহিঃপ্রকাশ বলে ধারণা করা যায়। কল্কিপুরাণে তাল, লয় ও রাগিণীর উল্লেখ, তাঁর সাঙ্গীতিক সতর্কতা ও সচেতনতার প্রমাণ। বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ জ্ঞান এবং ধর্মবিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যের দরুণ তিনি সমকালীন সমাজে 'পণ্ডিত রামলোচন' হিসেবে পরিচিতি পান। পাণ্ডিত্যে, বৈদগ্ধ্যে এবং বিদ্যানুরাগের কৃতিত্বে তিনি দিনাজপুর অঞ্চলের সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে পরিচিতি লাভ করেন এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে সম্মানও অর্জন করেন। কল্কিপুরাণের রচয়িতা হিসেবে তারকনাথের সভাসদ কর্তৃক শ্রীরামলোচন দাসের নাম প্রস্তাবের মধ্যেও তাঁর জনপ্রিয়তা ও পরিচিতির পক্ষে সমর্থন মেলে।

দাম্পত্যজীবনে কবিকে নানা চড়াই-উৎরাই ও ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। তিনি তিনবার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর প্রথমা স্ত্রীর নাম ছিল আনন্দময়ী। বিবাহের কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বাধ্য হয়ে কবিকে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করতে হয়। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে তাঁর দ্বিতীয় পত্নীও একমাত্র কন্যা সন্তান রেখে স্বর্গবাসী হন। তারপর কবি তারাসুন্দরী নাম্নী এক রমণীকে বিবাহ করেন। তারাসুন্দরীর গর্ভে কবির ঔরসজাত দুই পুত্র ও এক কন্যা-সন্তান জন্মলাভ করে।

জ্ঞানে ও পাণ্ডিত্যে বিখ্যাত কবির বিনয়বোধ প্রশংসার দাবি রাখে। আত্ম-প্রশংসা ও নিজ মাহাত্ম্য প্রচারের চেয়ে তাঁর মধ্যে বেশি ক্রিয়াশীল ছিল আত্মদৈন্যবোধ। রচনাকর্মের অনেক স্থানে নিজের দীনতার অকপট স্বীকারোক্তি লক্ষ করা যায়।

ক. তাঁহার নন্দন অতি কুভাজন
শ্রীরামলোচন দাস।
সর্ব্ব কর্ম্মে ক্ষীণ বিদ্যাতে বিহীন
অজ্ঞানী নামে প্রকাশ।। (পৃ. ৫)

খ. মূর্খের সঙ্গীত নহে সুললিত
নানা দোষান্বিত হয়।
তবু বিজ্ঞগণ অবিজ্ঞ-কথন
না করিবে সদাশয়।। (পৃ. ৫)

টেরকি গ্রাম কবি রামলোচন দাসের জন্মস্থান হলেও, কবির কোনো পূর্ব পুরুষ ঢাকা জেলার কোনো স্থান হতে এ-গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন বলে ধারণা করা হয়। তখন থেকেই পুরুষানুক্রমে কবির বংশধরেরা এ-গ্রামেই বাস করতে থাকেন। কবি উত্তরাধিকার সূত্রেই এ-গ্রামের বাসিন্দা। বিচিত্র কর্মময় জীবনের সমাপ্তিতে এ-গ্রামেরই নিজ বাড়ীতে ১২৭৪ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে (১৮৬৭ খ্রি:) তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।[৩৪] তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। কবি একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা হলেও, এই আলোচনা মূলত 'শ্রীকল্কিপুরাণ' গ্রন্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। যেহেতু এই একটি মাত্র গ্রন্থই পুরোপুরি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। শ্রীকল্কিপুরাণ-গ্রন্থটি উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদের গোড়ার দিকে রচিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। গ্রন্থটি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ থেকে ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এ-প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বলা প্রয়োজন যে রামলোচন দাস মধ্যযুগেই (১৮ শতকে) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর 'শ্রীকল্কিপুরাণ' রচিত হয়েছে মধ্যযুগের সমাপ্তিতে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। তবে এ-কাব্যে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের বিষয় ও গঠনরীতি অনুসৃত হয়েছে। তাই বিষয় ও গঠনগত বিচারে কবিকে মধ্যযুগীয় কবি হিসেবেই বিবেচনা করা যায়।

ব্যাসদেব প্রণীত সংস্কৃত পুরাণের অন্যতম 'কল্কিপুরাণ'। কল্কি বিষ্ণুর দশম অবতার। কথিত আছে যে কলিযুগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কলি। ক্রোধের ঔরসে তদীয় ভগিনী হিংসার গর্ভে তার জন্ম। কলির শেষাবস্থায় ধর্মাধর্ম লোপ পাবে, হিন্দু যবন ম্লেচ্ছ সব একাকার হয়ে যাবে। কলিযুগের অন্তকালে ভগবান বিষ্ণু সম্ভল নামক গ্রামে বিষ্ণুযশ নামে এক ব্রাহ্মণের ঔরসে এবং তদীয় স্ত্রী সুমতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন। এই ভগবান বিষ্ণুই কল্কিরূপে অবতীর্ণ হয়ে দেবদত্ত অস্ত্রের সাহায্যে দুষ্কৃতের বিনাশ সাধন করে ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করবেন। আবার সত্যযুগ প্রবর্তিত হবে। কল্কির এই চরিত্র ও কর্মমাহাত্ম্যের জন্যই হিন্দুগণ ভগবান কল্কির চরিত-কথা আগ্রহের সঙ্গে শ্রবণ করেন, তাঁর কৃপালাভের আশায়। কাব্যে কবির বক্তব্যেও উপর্যুক্ত বর্ণনার পক্ষেই সমর্থন রয়েছে।

এই মত যেবা জন করিবে গান শ্রবণ
ভবে মুক্ত কল্কীর কৃপায়।

ইহকালে পাবে সুখ না হইবে কোন দুখ
নির্ভয় সে কালান্তের দায়।।
শ্রবণের ফল যত বিধি নাহি পারে তত
চতুর্ম্মুখে সংখ্যা কহিবার।
শ্রীরামলোচন কয় শুনিলে গান নিশ্চয়
সুখমোক্ষ করতলে তার।। (পৃ. ৯)

কিন্তু কথক কর্তৃক ব্যাখ্যাত সংস্কৃত ভাষায় রচিত এ-পুরাণ-আখ্যান সাধারণের গ্রহণ ক্ষমতার বাইরে ছিল বলে, এটি ব্যাপক প্রচার পায়নি। তাছাড়া অন্যান্য জনপ্রিয় পুরাণকাহিনী যেখানে বহুপূর্ব থেকেই বিভিন্ন কবির মাধ্যমে বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে আসছে; সেখানে 'কল্কিপুরাণ' কোন কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। ধারণা করা হয়, কবি শ্রীরামলোচন দাস-ই 'কল্কিপুরাণে'-র প্রথম বাংলা অনুবাদক।

কবি 'শ্রীকল্কিপুরাণ'-এর অনুবাদক হলেও তিনি এর আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি, ভাবানুবাদ করেছেন মাত্র। সেজন্য গ্রন্থে মৌলিক প্রতিভার ও যোগ্যতার পরিচয় দান করা তাঁর পক্ষে সহজতর হয়েছিল। কবি 'কল্কিপুরাণ'-এর প্রথম অনুবাদক, এ বিবেচনায় তিনি মধ্যযুগীয় অনুবাদ ধারার দুই দিকপাল কবি কৃত্তিবাস ওঝা ও মালাধর বসুর সমগোত্রীয়। কবি সংস্কৃতপুরাণের কাহিনীকে অতি সংক্ষেপে নিজস্ব আদর্শ ও পরিকল্পনা অনুসারে বাংলা ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। এতে মূল কাহিনী দ্রুতগতিতে পরিণতির দিকে এগিয়ে গিয়েছে ।

সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী এই কবির কাব্য কখনো কখনো খুব বেশি সংস্কৃত-প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। এতে কাব্যের কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাষা কৃত্রিম ও দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। ভাষা-শব্দ- অলঙ্কারের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সংস্কৃতের বহুল প্রভাব সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।

বদন-চন্দ্র তোমার নিতান্ত কান্তে আমার
সুখদাতা কাম-তাপহর।
ওগো চঞ্চল-নয়নি তব লাবণ্য এমনি
যেন অমৃত-রস-পর।।
কাম-ভুজংগ-দংশনে বিষেতে কাতর জনে
কান্তে শান্তি কতগো তাহার।
যে জন জীবনাশ্রিত দুর্লভা তিনি নিশ্চিত
পরাণ গো পরাণ-আধার।। (পৃ. ৩৮)

তবে সামগ্রিক বিচারে এই কাব্যের ভাষা সরস ও গতিময়। তৎসম শব্দ, সমাসবদ্ধপদ ও অলঙ্কারের বাহুল্য এই কাব্যের কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাষার স্বাভাবিক গতিময়তা ব্যাহত করেছে। তবে ভাষার সারল্যই এই কাব্যের প্রায় সর্বত্র প্রধানরূপে বর্তমান থেকেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

নিতান্ত এ লালসা মনে হইল রাজার।
এ গুপ্ত পুরাণ কথা ভাষা করিবার।।
তবে সে প্রকাশ হবে শুনিবে সকলে।
কিরূপে হইবে ভাষা মহীপাল বলে।।
বিনা ভাষা প্রকাশের হেতু অন্য নাই।
ভাষা করে যোগ্য জন দেখিতে না পাই।। (পৃ. ৭-৮)

পুরাণের কাহিনী হলেও 'শ্রীকল্কিপুরাণ'-গ্রন্থে কবির বাঙালি জীবন ও সমাজলব্ধ অভিজ্ঞতা প্রযুক্ত হয়েছে। বাঙালি জীবনের প্রভাব এ-কাব্যে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। তাই গ্রন্থের চরিত্রগুলোও যেনো বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয়ই বহন করে। 'রাজসভায় কল্কীকে না দেখিয়ে পদ্মার খেদ'-অংশে বিরহ-কাতরা বাঙালি নারীর মানসমূর্তিই স্মরণে আসে।

শুনলো বিমলা সই মন দুঃখ কই।
সজীবনে চিন্তা-চিতানলে দগ্ধ হই।।
বিমলা লো ! কি লিখিল বিধি মম ভালে।
বুঝি ঘটাইল শীঘ্র মরণ অকালে।।...
বৃথা এই দেহে নাহি রাখিব জীবন।
এ পাপিনী তাপিনীর ঘটিল মরণ।।
এখনি শ্রীকান্ত ভাবি পাবকে পরাণ।
পরিত্যাগ করিব গো বলি বিদ্যমান।। (পৃ. ২৬)

কাব্যের বিভিন্ন চরিত্রের প্রতি পাঠকের আন্তরিকতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কবির ভাষা-ব্যবহার বহুক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এভাবে ভাষা-ব্যবহারে কবির সচেতন শিল্প-চাতুর্য আমাদের মুগ্ধ না করে পারে না। এরূপ ভাষা-ব্যবহারের মাধ্যমে কবি-হৃদয়ের অন্তরঙ্গ স্পর্শও অনুভূত হয়। কবির এ-কাব্যের অনেক স্থানে, বিশেষ করে আত্মনিবেদন, বিলাপ, খেদ ও দুঃখপ্রকাশের ক্ষেত্রে এ-ধরনের (রে, লো, গো, হে, ওহে) আন্তরিকতাপূর্ণ ভাষাভঙ্গি প্রযুক্ত হতে দেখা যায়।

ক. আমারে হেরিলে সদ্য পুরুষ রমণী।
হয় লো বিমলা সখি অভাগ্য এমনি।। (পৃ. ২৬)

খ. মন রে আমার শুন শ্রীহরি সংকীর্ত্তন বসিয়া।। (পৃ. ৮)

গ. ওহে সনাতন আমি কি হেরিলাম
অপরূপ রমণী মণি।। (পৃ. ২২)

রামায়ণ-মহাভারত সহ মধ্যযুগের সমস্ত রচনাই গীত হতো। তাই রচয়িতাগণ গীত-ছন্দ ও তাল-লয়ের প্রতি সচেতন থাকতেন। শ্রীরামলোচনের শ্রীকল্কিপুরাণও গীত হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই রচিত হয়েছিল। গ্রন্থের 'গান-শ্রবণ-প্রকরণ'-অংশে কবির বর্ণনা থেকে এ-সত্য প্রতীয়মান হয়। কবি তাঁর গ্রন্থটিকে গান হিসেবে উল্লেখ করে এর উপস্থাপন- পদ্ধতিটিও শ্রোতা-দর্শকের সম্মুখে বর্ণনা করেছেন। গান শ্রবণের মাহাত্ম্য এবং গান শেষে গায়ককে উপহার প্রদানের প্রসঙ্গটিও বাদ পড়েনি।

দিন করি শুভক্ষণ করিবে গান শ্রবণ
চন্দ্রাতপে সাজাইয়া প্রাঙ্গণ।.... .
গায়ককে পুরষ্কার দিবে নানা উপহার
বস্তু অলঙ্কার আর ধন।। (প. ৮-৯)

নানা রাগ-রাগিণী ও তাল-লয় যুক্ত বহু গান সন্নিবেশিত হয়েছে এ-কাব্যে। প্রতিটি গানের শীর্ষদেশে রাগ ও তাল নির্দেশিত হয়েছে। যা সঙ্গীত রচনায় তাঁর বিশেষ কৃতিত্বই নির্দেশ করে। ভক্তিরসপূর্ণ সঙ্গীতরচনার মধ্য দিয়ে যাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূচনা, তাঁর রচনায় রাগ-রাগিণী তাল-লয় সমন্বিত সুললিত সঙ্গীত প্রাধান্য লাভ করবে এটাই স্বাভাবিক। গ্রন্থের সঙ্গীতে প্রযুক্ত উল্লেখযোগ্য রাগ-রাগিণী নাম: ঝিঝিট, রামপ্রসাদী, বাহার, বাগেশ্রী, খাম্বাজ, জঙ্গলী, ভৈরবী, বেহাগ, মল্লার, আলেয়া, ছায়ানট, ললিত; এবং তালের নাম: মধ্যমান, ঠেকা, আড়াঠেকা, জলদ-তেতালা, একতালা, বিভাষ ইত্যাদি।

কবির কাব্যে সমকালে প্রচলিত পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দই ব্যবহৃত হয়েছে। ত্রিপদী ছন্দের বেলায় অবশ্য তিনি ৬/৬/৮-মাত্রার লঘু ত্রিপদী এবং ৮/৮/১০-মাত্রার দীর্ঘ ত্রিপদী, দুইই ব্যবহার করেছেন। তবে দীর্ঘ ত্রিপদীর ব্যবহারই কাব্যে বেশি।

লঘু ত্রিপদী : শুনহ অনন্ত বিষ্ণু-ভক্তি মন্ত
জলে কি হৈল দর্শন।

স্থলে কি কারণ নিরখি এমন
মহাব্যগ্র তব মন।। (পৃ. ৪৫)

দীর্ঘ ত্রিপদী : সকল ভূপতিগণ মুনি তরে নিবেদন
করেন বিনয় করি অতি।
এথা হৈল কি কথন তব কল্কীর সদন
সবিশেষ বল মহামতি।। (পৃ. ৪৩)

পয়ারের ক্ষেত্রে চতুর্দশাক্ষর-বিশিষ্ট পয়ার ছন্দই ব্যবহৃত হয়েছে :

কাঞ্চনীপুরের রাজা করে রমাপতি।
শান্ত-দান্ত সুধীমন্ত নামে মহামতি।।
অমর্য তাহার সুত অতি গুণধাম।
তাহার নন্দন ধরে সহস্রাক্ষ নাম।। (পৃ. ৬৫)

কবি এ- কাব্যে শুধু প্রচলিত পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দই ব্যবহার করেননি। এর বাইরে তিনি ভিন্ন প্রকার ছন্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর এরূপ প্রচেষ্টার ফলে কাব্যে সংযোজিত হয়েছে 'চৌপদী ছন্দ'। ৮/৮+৮/৮-মাত্রার এ- চৌপদী ছন্দ তিনি গ্রন্থের প্রতিটি গান রচনার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেছেন। তবে গানের ধ্রুপদ অংশে চতুর্দশাক্ষর-বিশিষ্ট পয়ার ছন্দই ব্যবহৃত হয়েছে। গানের যে-অংশ গলা ছেড়ে বা চড়া সুরে গাইতে হয়, সেই প্রতিটি 'চিত্যান'-অংশে চৌপদীর ব্যবহার লক্ষণীয়।

বিবাহমঙ্গল-বাসরে পূর্ণ আনন্দ অন্তরে
হেরিতে চল সত্বরে আহলাদ পাবে তথায়।।
নানামত রাগরঙ্গ বাজায় বীণা মৃদঙ্গ
শুনিলে পুলক অঙ্গ বিদ্যাধরী নাচে গায়।।
শ্রীরাম লোচন কয় নগরে আনন্দময়
সবে করে জয় জয় বিপ্রচয় বেদ কয়।। (পৃ. ১০২)

'শ্রীকল্কিপুরাণ'-গ্রন্থে কবির উল্লেখযোগ্য মনোভঙ্গির পরিচয় মেলে বর্ণভেদ প্রথার বিলুপ্তিসাধনের প্রচেষ্টায়। শাস্ত্রকথা পরিবেশনের কিংবা শ্রবণের ব্যাপারে কোনো কোনো বর্ণ বা শ্রেণী বিশেষের একচ্ছত্র আধিপত্যকে অস্বীকার করেছেন কবি। কবি তাঁর ঈপ্সিত দেব-চরিত্রের মাহাত্ম্য-প্রচারে ব্যাপকভাবে সচেষ্ট ছিলেন। আর এ-জন্য অনূদিত গ্রন্থকে সর্বজনীন করার প্রয়াসে বর্ণবিভেদের অচলায়তন ভেঙে সর্বসাধারণের কাছে এর তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। কবি

শাস্ত্রকথা ও ধর্মকে শ্রেণী বিশেষের 'উত্তরাধিকার' হিসেবে সীমিত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। এ- প্রসঙ্গে গ্রন্থের শ্রবণ-প্রকরণ সংক্রান্ত কবির বক্তব্য স্মরণযোগ্য:

গুরু দ্বিজ বন্ধুগণ যত পুরবাসী জন
সবারে করিবে নিমন্ত্রণ।।
সকলেরে সমাদরে বসাইয়া সরাসরে
ভেদ না করিবে জাতিকুল।
প্রশুদ্ধ আসন দিয়া বিনয় কাব্য বলিয়া
পরে দিবে তামাক তাম্বুল।। (পৃ. ৮)

বিষ্ণুযশের ঔরসে এবং সুমতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেও কল্কি দেবলোকে বিষ্ণুর অবতার হিসেবেই পরিচিত, মানুষ হিসেবে নয়। মুনিগণ ও বৈশাখ যূপ রাজা 'ক্রোড়স্থিত বিষ্ণুরূপ দেখি নরাকার' ও কল্কিমুখ-চ্যুত বচন শুনে তার প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয়। কল্কিকে শিক্ষা প্রদান করেন পরশুরাম। মহাদেবের কাছ থেকে লাভ করেন গরুড়ের তুল্য 'অশ্ব', ত্রিকালজ্ঞ 'শুক' এবং রতন-মণ্ডিত প্রভাযুক্ত অস্ত্র 'করবাল'। দেবতাদের এই আনুকূল্য তাঁকে সাহস ও প্রেরণা জোগায় এবং তিনি নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন। তাঁর উপর সর্বদা বর্ষিত হয় দেবলোকের আশীর্বাদ। বিভিন্ন পর্যায়ে কল্কি অলৌকিক ক্ষমতাও প্রদর্শন করেন।

ক. তব চতর্ভুজ দেহ দেবের দুর্লভ এই
ছাড়ি হও মনুষ্য এখন।
শুনি কমল নয়ন তখনি দ্বিভুজ হন
দেখি পিতামাতার বিস্ময়।। (পৃ. ১৪)

খ. রাজগণ নারী হৈয়া পদ্মা সহচরী।
দরশন করিলেন কল্কিরূপ হরি।।
সে সকল নারী রাজা শ্রীপদ স্পর্শনে।
পুনশ্চ পুরুষ হৈলা দেখে সর্ব্বজনে।। (পৃ. ৪০)

কল্কিও এ-ব্যাপারে আত্মসচেতন ও অবগত যে 'কলিকে নিগ্রহ হেতু বিধি প্রার্থনাতে' ও 'ধর্ম্ম সংস্থাপন করি কলিকাল লয়'-এর জন্যই তাঁর জন্ম।

সবে মম অংশ হয় কলি ভ্রষ্ট মন।
দমন কারণ মম জনম ধারণ।।
রাজসূয় অশ্বমেধ সব যাগ দ্বারে।

সাবধানে মহারাজ যজহ আমারে।।
আমি পরলোক-ধর্ম্ম বটি সনাতন।
কালের স্বভাবে কর্মগত সর্ব্বজন।।
চন্দ্র-সূর্য্য বংশ জাত যত রাজগণ।
পুনঃ সত্যযুগ করি করিব স্থাপন।। (পৃ. ২০)

কবি শ্রীরামলোচন দাস তাঁর কাব্যেও কল্কিকে কলিযুগের তমোনাশক ও সত্য যুগের প্রবর্তক হিসেবে চিত্রিত করতে প্রয়াসী। সেজন্য কবিও তাঁকে দেববৈশিষ্ট্য ও অলৌকিক শক্তির সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে মানবীয় বৈশিষ্ট্যে অভিষিক্ত করতে সচেতন প্রয়াস গ্রহণ করেননি। তাই বিপক্ষ শক্তি শুদ্ধোদনের সঙ্গে যুদ্ধরত কল্কি আপন শক্তির মাহাত্ম্যে নয়, অলৌকিক শক্তির মায়ায়ই জয় লাভ করেন।

তাদের সম্মুখে হরি তখন আইলা।
বৌদ্ধ-প্রতি ভগবান মায়া দেখাইলা।।
বৌদ্ধ দেখে নিজ মাতা আসিয়া তখন।
অতি উচ্চনাদ করি করিছে রোদন।।
হীনবল পৌরুষ হইল সেইক্ষণ।
বিস্ময়াবিষ্ট মানস হৈয়া বৌদ্ধগণ।।
কল্কীকে দেখিয়া তাঁর নিজ জনগণ।
মায়া দূরে গেল সরে উঠিলা তখন।।
কল্কী আসি করে করে ম্লেচ্ছ সংহারিতে।
অতি উচ্চ তুরঙ্গ বাহনে ত্বরান্বিতে।। (পৃ. ৫৬)

তবে এই দেব-মহিম চরিত্র কল্কি রামলোচনের বর্ণনা অনুসারে দেবসুলভ মনোভাব বিস্মৃত হয়ে প্রেমকাতর প্রেমিকের মতো পদ্মার কেবল দৈহিক রূপ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন এবং প্রেমিকার প্রতিটি অঙ্গের আপত্তিকর বর্ণনায় মত্ত হন। এ-ধরনের আপত্তিকর প্রসঙ্গ উচ্চারণের সময় তাঁর দেবসুলভ রুচিবোধ কোনো সঙ্কোচ অনুভব করেনি। এ-অসঙ্গত কর্ম ও আচরণ কবির আরাধ্য কল্কি চরিত্রকে দেবমহিমায় ভাস্বর হতে সহায়তা করেনি। বরং এর ফলে কল্কি চরিত্র অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত রূপেই প্রতিভাত হয়।

প্রিয়ে তব বাহুদ্বয় অতি সুমনোজ্ঞ হয়
হৃদি স্থিত-শোভে যুগ্ম স্তন।

কুচ কঠিন বিস্তার কি কব উন্নত তার
উচ্চ করে বুকের বসন।।
এ হেন প্রবীণ স্তন নখাঙ্কুশে বিদারণ
বল প্রিয়ে করি গো এমন।
করীন্দ্র-কুম্ভ যেমন ক্ষত করে ঘন ঘন
মাহুত করিয়া আক্রমণ।। (পৃ. ৩৮)

এ গ্রন্থ- অনুযায়ী সিংহলের রাজকন্যা পদ্মাবতীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন কল্কি। পরবর্তী সময়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে সত্যযুগ এবং ধর্মের। তাঁদের কাছ থেকে কল্কি কলির অত্যাচার সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে অবগত হন এবং কলির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। কল্কির সঙ্গে রণে পরাজিত হয়ে কলি রাজ্য ছেড়ে পলায়ন করে। জন্মের পূর্বে নির্ধারিত পথ ও পন্থায়-ই কল্কি শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হন। কবি শ্রীরামলোচন দাস পুরাণ-বর্ণিত নির্দিষ্ট কাহিনী অনুবাদ করলেও আপন বোধ ও অভিজ্ঞতা বিস্মৃত হননি। এ- সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যসমৃদ্ধ প্রমাণ উদ্ধৃত হয়েছে এ-নিবন্ধে। আর ভাষা ব্যবহারে কবির সচেতনতা ও নিপুণতা এবং কাব্য-কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পূর্ণাঙ্গ সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন গানের পরিকল্পনা—তাঁর কৃতিত্বেরই স্বাক্ষর বহন করে।

বহু গ্রন্থপ্রণেতা কবি রামলোচন দাস প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে টাঙ্গাইল জেলার গৌরবকে আরো বর্ধিত করেছেন। তবে বিদ্বৎ-সমাজে এ-কবি এখনও অনেকটা অপরিজ্ঞাত রয়ে গেছেন। তাঁর জীবন ও রচনা-বিষয়ে আরো অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। এর ফলে এই প্রাচীন কবি ও তাঁর সাহিত্যকর্মের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের ক্ষেত্র আরও ব্যাপক হতে পারে।

সাত : অন্যান্য কবি

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস বিষয়ক নানা গ্রন্থ থেকে টাঙ্গাইলবাসী এমন অনেক কবির নাম জানা যায়, যাঁদের পূর্ণাঙ্গ জীবন-বৃত্তান্ত কিংবা সম্পূর্ণ রচনা উদ্ধার করা এখনও সম্ভব হয়নি। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত এসব কবিদের অসম্পূর্ণ জীবন-বৃত্তান্ত কিংবা অসম্পূর্ণ রচনাপরিচিতি—ঐতিহাসিক সত্য-সমর্থিত। প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতার সীমাহীন বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও, এসব কবির কীর্তি-মাহাত্ম্য দীর্ঘপথপরিক্রমার মাধ্যমে বর্তমান কাল পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে।

'কাশীখণ্ড'- গ্রন্থের রচয়িতা কবি কেবলকৃষ্ণ বসু[৩৪ক] বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন আঠারো শতকে। প্রাচীন আটিয়া পরগনার (আধুনিক টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানার) কেদারপুর গ্রামে ১৭৪৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। শ্রীরসিকচন্দ্র বসু কর্তৃক টাঙ্গাইল জেলা-অঞ্চল থেকেই সংগৃহীত হয় 'কাশীখণ্ড'- এর একটি খণ্ডিত পুথি।[৩৫] সংস্কৃত স্কন্দপুরাণ অনুবাদের মাধ্যমে তিনি রচনা করেন তাঁর কাব্য। সাতখণ্ডে বিভক্ত স্কন্দপুরাণের চতুর্থ অংশ 'কাশী খণ্ড'। এ-খণ্ডে উপস্থাপিত হয়েছে বিদ্যানারদ সংবাদ, পাতিব্রতাচরিত, অগ্ন্যাদির উৎপত্তি, লোকবর্ণন, গঙ্গামাহাত্ম্য, কাশীমাহাত্ম্য, কলাবতীর উপাখ্যান, কার্য্যাকার্য্য, দিবোদাস উপাখ্যান, কাশীবর্ণন এবং কাশীর উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহের বর্ণনা। সংস্কৃতপুরাণের কাহিনী-উপকাহিনী কবির নিজস্ব অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ মেধামননের জারকরসে সিক্ত হয়ে এ-কাব্যের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাচীন আটিয়া পরগনার (বর্তমান টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর থানার) অন্তর্গত নাগরপাড়া গ্রামের আর এক কবি আরাধন বাগচী।[৩৬] তাঁর রচিত গ্রন্থ 'সত্যমঙ্গল' বা 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী'। সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর মিশ্রদেবতা,-হিন্দুদের কাছে সত্যনারায়ণ, মুসলমানের কাছে সত্যপীর। সত্যপীর অর্বাচীন কালের লৌকিক দেবতাচরিত্র হিসেবে পরিচিত। কেবল দু'টি অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণে (স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে এবং বৃহদ্ধর্ম পুরাণের উত্তর অংশে) এ-কাহিনীর উল্লেখ আছে, যেখানে সত্যপীর চরিত্র রূপান্তরিত হয়েছে ছদ্মবেশী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রূপে। এ-কাহিনী দুটি উপকাহিনীতে বিভক্ত। প্রথম কাহিনীতে ছদ্মবেশী সত্যনারায়ণের আশীর্বাদধন্য এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কথা এবং দ্বিতীয় কাহিনীতে এক বণিকের কথা রয়েছে। দ্বিতীয় কাহিনীতে বণিক ও তাঁর জামাতা-কন্যা কর্তৃক সত্যনারায়ণের পূজার প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শনের এবং তাঁকে বিস্মৃত হওয়ার ফলে অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগের বিষয় এবং পুনর্বার তাঁকে স্মরণের মাধ্যমে দুর্দশা থেকে তাদের (বণিক ও তাঁর জামাতা-কন্যার) উদ্ধারপ্রাপ্তির কাহিনী। সত্য চরিত্রের অলৌকিক শক্তি-মাহাত্ম্য উপস্থাপনই এ-ধারার সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। কবি আরাধন বাগচী এ-কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করেন, যাতে রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা এবং ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার সংমিশ্রণ ঘটেছিল বলে জানা যায়। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য: 'কাশীখণ্ডে'র রচয়িতা কবি কেবলকৃষ্ণ বসুও এ-কাহিনী অবলম্বনে 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'-নামে অপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

পূর্বকালের আটিয়া পরগনার (আধুনিক টাঙ্গাইলের) কবি ত্রিলোচন চক্রবর্তী।[৩৬ক] আঠারো শতকের শেষভাগে তিনি রচনা করেন কুরুপাণ্ডবদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ-বিষয়ক কাব্যগ্রন্থ 'ভারত-পাঁচালী'। এ-কাব্যের একটি পুথি সংগ্রহ

করেন শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।[৩৭] পাণ্ডুর পুত্র যুধিষ্ঠির-ভীম-অর্জুন-নকুল-সহদেব এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধন- দুঃশাসন প্রমুখ শত পুত্রের মধ্যকার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বা ভারত-যুদ্ধই এ-গ্রন্থে উপস্থাপিত মূল ঘটনা। এ-ঘটনার মধ্য দিয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রনৈতিক ও নৈতিকতা সম্পর্কিত নানাবিধ বিষয় এবং শৌর্য-বীর্য, ন্যায়পরতা, সত্য-প্রতিজ্ঞতার ব্যাপক প্রতিফলন ঘটেছে। ব্যাসদেব কৃত সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনী অনুবাদের মাধ্যমে ও সামাজিক জীবন থেকে আহৃত অভিজ্ঞতার আলোকে কবি ত্রিলোচন চক্রবর্তী 'ভারত-পাঁচালী' রচনা করেন।

ষোল শতকে এ-জেলা অঞ্চলে আবির্ভূত হন 'জগন্নাথ বিজয়'- কাব্যের কবি মুকুন্দ ভারতী।[৩৮] শ্রীরসিকচন্দ্র বসু এ-কাব্যের একটি খণ্ডিত পুথি সংগ্রহ করেন। কবির কাব্যে অত্যন্ত নিপুণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে কৃষ্ণলীলা। জগন্নাথক্ষেত্র তথা জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্যবিষয়ক কাব্য 'জগন্নাথ বিজয়'। শ্রীমদ্ভাগবতের মুখ্য অংশ কৃষ্ণচরিত। এ-কাব্য রচনায় ভাগবতের দশম স্কন্ধের কৃষ্ণলীলা অংশই কবির প্রধান অবলম্বন। তবে অন্যান্য পুরাণ (যেমন— ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ) থেকেও কবি কাহিনী-উপকাহিনী গ্রহণ করেছেন, বিষয়কে সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করার আশায়।

প্রাচীন আটিয়া পরগনার (আধুনিক টাঙ্গাইলের নাগরপুর থানার) কেদারপুর গ্রামের অধিবাসী মধ্যযুগীয় কবি শ্যামচাঁদ গুপ্ত।[৩৮ক] কেদারপুর গ্রামেই তাঁর জন্ম ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে (আনু.) এবং মৃত্যু ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে। ভূ-প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের আনুকূল্যে বিল-ঝিল নদ-নদী বিধৌত (বিশেষ করে বর্ষাকালে জলপরিপূর্ণ) এ-অঞ্চলে সাধারণভাবে নৌকাচালনা বা নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা স্বাভাবিক ব্যাপার। নৌকা বাইচের ক্ষেত্রে, এ-জেলা অঞ্চলের মধ্যে কবির জন্মস্থান নাগরপুর এলাকা শীর্ষস্থানীয়। আর এই নৌকাবাইচের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত 'সারিগান'। এ-অঞ্চলে নৌকাবাইচের সময়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে 'সারিগান' গীত হয়। শ্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত এ-ধরনের সঙ্গীত বৈঠার ওঠাপড়ার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছন্দ-লয়ে রচিত। বিরহ, বিচ্ছেদ, ধর্মতত্ত্ব, দৈনন্দিন জীবন, সমসাময়িক ঘটনা, রাধা-কৃষ্ণ প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় এ-ধারার সঙ্গীতের প্রধান উপজীব্য। কবি শ্যামচাঁদ গুপ্তও বিচিত্র বিষয়ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক 'সারিগান' রচনা করেন। তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরী সাহিত্যিক রামপ্রাণ গুপ্ত তাঁর রচিত গান সংগ্রহ ও সম্পাদনা করেন 'সারিগান'[৩৯] নামে।

টাঙ্গাইলের আর এক প্রাচীন কবি মুক্তারাম নাগ,[৪০] 'দুর্গামঙ্গল'- কাব্যের রচয়িতা। তাঁর সমকালে প্রচলিত সংস্কৃত মার্কণ্ডেয় পুরাণের 'দুর্গাসপ্তশতী'-অংশে উপস্থাপিত দেবী দুর্গার অসুর দলনের কাহিনীকে কবি কাব্যের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেন। উপরিউক্ত কাহিনীকে কাব্যের বিষয়রূপে গ্রহণ করলেও তিনি 'দুর্গামঙ্গল'-

কাব্যের অন্য এক বিখ্যাত কবি ভবানীপ্রসাদ রায়ের মতো পুরাণকাহিনীর সঙ্গে সমন্বিত করেন বাঙালি হিন্দুসমাজজীবনে প্রচলিত দেবী দুর্গার কাহিনী ও পূজা পদ্ধতিকে। অর্থাৎ কবি মুক্তারাম নাগের 'দুর্গাঙ্গল'-কাব্য মূলত পুরাণ-কাহিনীভিত্তিক রচনা হলেও, শুধু পুরাণের সীমাবদ্ধ অঙ্গনে পরিভ্রমণে কবি সন্তুষ্ট ছিলেন না। পুরাণের সীমানা অতিক্রমণের এই প্রচেষ্টা তাঁর মেধা-মনন ও প্রতিভাদীপ্ত কৃতিত্বের পরিচয়কে বর্ধিত করেছিল বলে মনে করা যায়।

মধ্যযুগীয় আর এক কবি বৈদ্য রামানন্দ। তিনি আধুনিক টাঙ্গাইল জেলার সদর থানার গালা গ্রামের অধিবাসী। পূর্বপ্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে কবি তাঁর 'চণ্ডীকাব্য'- রচনা করেন। তবে তাঁর কাব্যে টাঙ্গাইলের আঞ্চলিক ঐতিহ্যের সমন্বয় ঘটেছিল, এ-ধরনের ধারণা পোষণ করা যায়।

আট : উপসংহার

এখন পর্যন্ত টাঙ্গাইলবাসী যে-সব প্রাচীন কবির জীবন ও সাহিত্য-সম্পর্কিত পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তা থেকে এ-সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে আঠারো শতক পর্যন্ত সৃষ্ট বাংলা সাহিত্যের প্রধান ধারাসমূহের অনেকগুলো অবলম্বনেই এ-অঞ্চলে সাহিত্য রচনা বা চর্চার প্রয়াস গৃহীত হয়েছে। প্রায় প্রতিটি ধারায়ই আবির্ভূত হয়েছেন একাধিক কাব্য-রচয়িতা। আর কাব্যরচনার জন্য বেছে নেওয়া বিষয়গুলোর ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল তৎকালীন সমাজে। সংশ্লিষ্ট কাব্যবিষয়গুলো গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল সমকালীন জনচিত্ত। জনসাধারণের আন্তরিক সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতেই এ-বিষয়সমূহ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছিল। যেহেতু জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার মাত্রাগত ঘাটতি অভিন্ন বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ-রচনার প্রয়াসকে ব্যাহত করতে পারতো।

টাঙ্গাইল জেলা-অঞ্চলে জন্মগ্রহণকারী কবিগণ মানসিকভাবে এ-অঞ্চলের ভৌগোলিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশের প্রভাবমুক্ত হতে পারেননি। বরং মানবজীবনের সহজাত অর্জন হিসেবে এসব তাঁদের মনোজগতে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছিল। তাই তাঁদের রচনাকর্মে স্বভাবতই জেলার নিজস্ব ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রাসঙ্গিক উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তাঁদের রচনায় এ-জেলার ভূ-প্রকৃতি, পরিবেশ ও সামাজিক-জীবনের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা যেখানেই হয়েছে, সেখানেই তাঁরা নিজস্ব জীবন-অভিজ্ঞতা ও আঞ্চলিক ঐতিহ্যের যথাসাধ্য রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। কবি শ্রীরায় বিনোদের কাব্যের 'নৌকাগঠন বর্ণনা' ও 'ঝড়-ঝঞ্ঝার বর্ণনা', মাধবাচার্যের কাব্যের 'কৃষ্ণকর্তৃক রাধাকে নদীপারাপারের বর্ণনা', ভবানীপ্রসাদের কাব্যের 'দুর্গা-পূজা-প্রচলন কাহিনী ও পূজাপদ্ধতি' ইত্যাদি বিষয় এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

টাঙ্গাইলের প্রাচীন কবি হিসেবে এখন পর্যন্ত পরিচয়প্রাপ্ত কবিগণের প্রায় অনেকেই তাঁদের রচনাকর্ম, বিষয় ও রচনাগত প্রভাবের বিচারে এক একটি কাব্য-ধারার প্রতিনিধিত্বকারী কাব্যরচয়িতা হিসেবে গণ্য হতে পারেন। বস্তুত বর্তমান সময় পর্যন্ত এ-অঞ্চলের সাহিত্যের ইতিহাসের পর্যালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণসূত্রে এ-সত্যই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এসব প্রাচীন কবির রচনায় গৃহীত সাহিত্যধারাগুলো লিখিত কিংবা মৌখিক সাহিত্য (=লোকসাহিত্য) হিসেবে এখনও এ-অঞ্চলে অনেকাংশেই সচল রয়েছে। অর্থাৎ এসব প্রবহমান সাহিত্য- ধারাস্পর্শে নতুন রূপে সৃষ্ট হয়েছে এ-অঞ্চলের লিখিত ও মৌখিক সাহিত্য। আর এসব সাহিত্যধারা সমকালীন সমাজ জীবনকেও প্রভাবিত করেছে। ষোল শতকের কবি শ্রীরায় বিনোদ মনসা-চাঁদ সদাগর-বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনীভিত্তিক যে-কাব্য (=পদ্মাপুরাণ) রচনা করেন, তাঁর সে-কাব্যের প্রভাব ও প্রবহমানতা শুধু দু'-এক শতকব্যাপি নয়, বরং মধ্যযুগের সীমারেখাকেও অতিক্রম করেছে। একালের কবি গলগণ্ডা গ্রামনিবাসী পূর্ণচন্দ্র মিত্র ওই অভিন্ন বিষয় ও আঙ্গিকে রচনা করেন 'পদ্মপুরাণ'।[৪১] টাঙ্গাইলের মির্জাপুর থানার ধল্লা গ্রামের কবি খন্দকার জোবেদ আলী রচনা করেন 'বেউলা-লখিন্দর'।[৪২] এছাড়া নাগরপাড়াবাসী শ্রীরসিকচন্দ্র বসুর 'বেহুলা',[৪৩] টাঙ্গাইল থানার গালা-গ্রামবাসী বিশিষ্ট নাট্যকার মন্মথ রায়ের 'চাঁদ সওদাগর' নাটক[৪৪] এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মৌখিক সাহিত্য (= লোকসাহিত্য) হিসেবে এ-কাহিনীভিত্তিক 'বেইলা নাচারি'[৪৫] টাঙ্গাইলে এখনও চালু রয়েছে। এমনকি 'পালাগান' হিসেবেও টাঙ্গাইলের নানা অঞ্চলে এ-কাহিনী আজও গীত হয়ে থাকে। টাঙ্গাইলের মধ্যভাগে, বিশেষ করে বাশাইলের 'কাশিল-বিয়ালা'-গ্রামাঞ্চলে এখনও এর যে-প্রভাব ও প্রচলন, তা উল্লেখ করার মতো। উল্লেখ্য টাঙ্গাইলের বিভিন্ন থানায় (বিশেষত ঘাটাইল-বাশাইল-টাঙ্গাইল-থানাঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে) গড়ে ওঠা 'বেহুলা-লখিন্দর'-গানের দল এ-অঞ্চলে এ-সাহিত্যধারার প্রবহমানতার সাক্ষ্য বহন করছে। আসলে মধ্যযুগের লিখিত সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়-কাহিনী কালক্রমে শুধু মৌখিক সাহিত্যের (=লোক সাহিত্যের) রূপেই টিকে থাকেনি, বরং এ-অঞ্চলের মধ্যযুগীয় লিখিত সাহিত্যের বিশিষ্ট ধারাসমূহের বর্তমান-গতিধারার সঙ্গেও প্রবহমান।

ষোল শতকেরই অন্য এক কবি শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য কবি মাধবাচার্য টাঙ্গাইল-অঞ্চলের গুপ্তবৃন্দাবন থেকে বৈষ্ণবধর্মের মাহাত্ম্যপ্রচার শুরু করেন। কবি শ্রীরায় বিনোদের কাব্যে 'বৈষ্ণব প্রসঙ্গ' রয়েছে। তবে তা চৈতন্যদেবপ্রচারিত গৌড়ীয় নব-বৈষ্ণবধর্মের পরিচয়বাহী নয়।[৪৬] কবি শ্রীরায় বিনোদ বৈষ্ণব ছিলেন, তবে তিনি চৈতন্যোত্তর রাগানুগ মার্গ-অনুসারী নববৈষ্ণব নন। কিন্তু মির্জাপুর-অঞ্চলের কবি ভবানীপ্রসাদ রায়ের কাব্যে 'বৈষ্ণব প্রসঙ্গ' তথা 'বৈষ্ণব বন্দনা'র

উল্লেখ রয়েছে। যা গৌড়ীয় নববৈষ্ণবধর্মের প্রভাবের স্মারক।[৪৭] টাঙ্গাইলের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত 'গুপ্ত-বৃন্দাবন'- এলাকা থেকে যে-বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কাজ শুরু হয়েছিল তা কালক্রমে দক্ষিণ টাঙ্গাইল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল, ভবানীপ্রসাদের চৈতন্যবন্দনা এর সন্দেহাতীত প্রমাণ। প্রমাণ মিলছে যে সে-সময়ে জেলার বিভিন্ন গ্রাম-জনপদে হিন্দু-সম্প্রদায়ের বিরাট অংশের মধ্যে নব-বৈষ্ণব মতবাদ যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল। এখনও টাঙ্গাইল জেলার মোট জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দুসম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। তাই একালেও এ-অঞ্চলে বৈষ্ণবসাহিত্যচর্চার ইতিহাস ও তালিকা দীর্ঘ। টাঙ্গাইলের বৈষ্ণবপাড়া গ্রামের নবদ্বীপদত্ত রচনা করেন বৈষ্ণবধর্মীয় 'সাধন-সংকেত'-[৪৮] গ্রন্থ। দয়াজানী গ্রামের গিরিশচন্দ্র রায়চৌধুরীর 'শ্রীচৈতন্য',[৪৯] আড়রা গ্রামের পূর্ণেন্দ্রমোহন ঘোষের 'নাম ভাগবত',[৫০] ডালা গ্রামের চিন্তামণি উমাকান্ত শর্মার 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ পদামৃতম্'ও 'বৈষ্ণবমঙ্গল রূপ'[৫১] এবং বান্দু বাউলজানী-নিবাসী রসিকমোহন বিদ্যাভূষণের 'শ্রীগৌরাঙ্গ' ও 'বিষ্ণুপ্রিয়া'-[৫২] কালিহাতী থানার পাঠণ্ডা-গ্রামবাসী সতীশচন্দ্র গুহদেব বর্ম শাস্ত্রী'র 'গল্পে ভাগবত'[৫২ক] এবং সন্তোষের জমিদার প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'গৌরাঙ্গ'[৫২খ] বৈষ্ণবসাহিত্যবিষয়ক উল্লেখযোগ্য রচনা। এছাড়া এ-জেলা-অঞ্চলে 'কৃষ্ণের ধুয়া' নামে এক ধরনের ধুয়াগান প্রচলিত আছে। কবি মাধবাচার্য কর্তৃক চৈতন্যদেবের নব-বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতেই 'কৃষ্ণের ধুয়া'-গান পরিপুষ্টি লাভ করেছিল।[৫৩] লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার মধ্যে টাঙ্গাইল-অঞ্চলে প্রচলিত উল্লেখযোগ্য আর একটি ধারা 'সারিগান'। স্মরণযোগ্য: শ্রীরায় বিনোদের কাব্যে 'সারিগান'-এর উল্লেখ রয়েছে।[৫৩ক] ভাগবতের 'কৃষ্ণলীলা'-কাহিনীভিত্তিক 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'- কাব্যের মধ্যে কবি মাধবাচার্য বিহারের আভীর সম্প্রদায়ের রাধাকৃষ্ণ'- বিষয়ক লোককাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। আর এতদ্বিষয়ক কাহিনীর মধ্যে প্রযুক্ত হয়েছে সারিগান। টাঙ্গাইলের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাযুজ্যই কাব্যে এ-গানের উপস্থিতিকে অনিবার্য করে তুলেছে। কবি শ্যামচাঁদ গুপ্তের 'সারিগান'-গ্রন্থ এ-ধারার সাহিত্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। টাঙ্গাইলের প্রাচীন কবিদের অনেকেই 'দুর্গা' বা 'চণ্ডী'-সংশ্লিষ্ট পুরাণকে কাব্যের বিষয় করেছেন। তবে তাঁদের কাব্যে পুরাণের সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে এ-অঞ্চলের লোকজীবন-আহৃত বিশ্বাস, রীতি-নীতি ও ধর্মীয় ধারণা। লিখিত সাহিত্যের দুর্গা বা চণ্ডী-বিষয়ক সে-ধারাই বর্তমানকালে মৌখিক সাহিত্যের (= লোকসাহিত্যের) রূপ পরিগ্রহ করেছে। টাঙ্গাইলের বিভিন্ন গ্রামে, বিশেষত হিন্দু-প্রধান গ্রামগুলোতে এখনও 'মঙ্গল যাত্রা' নামে দুর্গা-চণ্ডী বা অন্যবিধ ধর্মীয় কাহিনী গীত-অভিনীত হয়। মধ্যযুগীয় পুথি-পাঁচালী ও অন্যান্য সাহিত্যধারায়ও নিবিষ্ট একালের কবিমন। তাই প্রাচীন বিষয়,

আঙ্গিক ও উপকরণের অনুসরণ যেমন চোখে পড়ে, তেমনি অভিন্ন বিষয়-উপকরণের মধ্যে রূপগত নতুনত্বও দুর্লক্ষ্য নয়। কালিহাতী থানার বল্লা-গ্রামনিবাসী কবি মুন্সী আবদুস্ সোবহানের 'সোনাভান ও হানিফা',[৫৪] মির্জাপুরের বানিয়ারা গ্রামের কবি মুন্সী তালেব আলীর 'রূপচাঁদ ও পদ্মাবতী',[৫৫] ধল্লা গ্রামের কবি খন্দকার জোবেদ আলীর 'মধুমালা',[৫৬] বীর বহরিয়া গ্রামের নীলকান্তবসুর 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী[৫৭] এ-ধারার সাহিত্য-নিদর্শন। এ-ছাড়া 'বাঁশী'- গ্রামের সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত 'তুলসীদাসী রামায়ণ'[৫৮] এ-অঞ্চলের অনুবাদসাহিত্যের নিদর্শন। আসলে বর্তমান সময়ে এ-জেলায় সাহিত্যের যেসব ধারা প্রচলিত আছে, তা লিখিত-ই হোক কিংবা মৌখিক সাহিত্যই (= লোক-সাহিত্যই) হোক, তার অতীত ইতিহাস যে আরো বেশি সমৃদ্ধ ও উজ্জ্বল ছিল, উপর্যুক্ত আলোচনাসূত্রে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এ-জেলা-অঞ্চলের কবিদের হাতেই সৃষ্ট হয়েছে অসংখ্য সাহিত্যকর্ম। কেবল সাহিত্যরচনাই নয়, নানা বিষয়ভিত্তিক সাহিত্যের বহুমুখী অনুশীলনও হয়েছে এখানে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এ-অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল একটি পেশাদার লিপিকর সম্প্রদায়, যাঁদের মাধ্যমে অনুলিখিত হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থ। স্মরণযোগ্য যে প্রাচীনকালে এ-অঞ্চলে হাতে- তৈরি- কাগজের কারখানা গড়ে উঠেছিল। তৎকালীন বাংলাদেশে 'আটিয়া'-র কাগজ উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হতো।[৫৯] সুতরাং এ-অঞ্চলের মানুষের সাহিত্য-প্রীতি ও সাহিত্যচর্চার ইতিহাস ও নিদর্শন সুস্পষ্ট এবং প্রশংসনীয়। তাই সঙ্গত কারণেই এ-অঞ্চলের প্রাচীন সাহিত্য-সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যকে মূল্যবান বলে বিবেচনা করা যায়। টাঙ্গাইলের সাহিত্য-সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যের এমন গৌরবময় ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও, বর্তমান আলোচনা খণ্ডিত হতে বাধ্য। এর কারণ উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সাহিত্য, সাহিত্য-প্রেমিক ও সাহিত্যিক-সম্পর্কিত নিদর্শনের প্রামাণিক তথ্য পাওয়া গেলেও, এদের অনেকেরই রচনাকর্ম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তবু সংগৃহীত এসব রচনাকর্ম ও রচনাকর্ম-সম্পর্কিত প্রামাণিক তথ্যের আশ্রয়ে এ-সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে প্রাচীন টাঙ্গাইল-অঞ্চলে বহুকাল ধরে গড়ে উঠেছিল এক 'সমৃদ্ধ সাহিত্যের পটভূমি'।

তথ্য সঙ্কেত :

১. ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সম্পা. শাকেরউদ্দিন আহমদ, ১৯৭৬, পৃ. ২ দ্র.।

২. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, শ্রী অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪ দ্র.।

৩. মুঘল শাসনামলেই সরকার 'বাজুহায়' ৩২টি মহালে বিভক্ত ছিল। এই ৩২টি মহালের অন্যতম ছিল 'বড়বাজু' মহাল। আর ঈশা খাঁ পূর্ববাংলার যে ২২টি পরগনার কর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন, তারও অন্যতম ছিল বড়বাজু পরগনা। তখনও আটিয়া ও কাগমারী স্বতন্ত্র পরগনা হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। (টাঙ্গাইলের ইতিহাস, খন্দকার আবদুর রহিম, ১৯৯২, পৃ. ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৯৯ দ্র.)

৪. বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ারস্ টাঙ্গাইল, ১৯৯০, পৃ. ৪ দ্র.।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪।

৬. La T. H. D. Touche-র 'Relics of the great Ice Age on the plains of Northern India'-প্রবন্ধে-মধুপুরের গড়াঞ্চলের সৃষ্টি যে বরফযুগেই সম্পন্ন হয়েছিল, এ বক্তব্যের সমর্থন মেলে।

৭. বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ারস্ টাঙ্গাইল, ১৯৯০, পৃ. ৫।

৮. এ নদীর পূর্বনাম বঙ্গেশ্বর বা বঙ্গেশ। ষোল শতকের কবি শ্রীরায় বিনোদের 'পদ্মাপুরাণ'-কাব্যে এ নদীর উল্লেখ রয়েছে।

ভালুকা নদী চলে স্রোতে পাথর ছিঁড়ে
তার পাছে জাএ বঙ্গেশ্বর।।
জত নদ নদী পুবে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে সবে
চলি গেল আরতি গঙ্গার। (পৃ. ২২৪)

ষোল শতকে নদীটি ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদী হিসেবে, কবির নিজ গ্রাম ধোবড়িয়ার পূর্বাঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হতো। এই নদী আধুনিক টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানার ধুবড়িয়া'র (বিনোদ-কবির জন্মস্থান) পূর্বদিক দিয়ে এবং জেলার মধ্য ভাগ দিয়ে বহমান। এ নদীটির ইতিহাস—বর্তমান যমুনা'র চেয়েও প্রাচীনতর। ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে 'রেনেলের' মানচিত্রে যমুনার উপস্থিতি নেই, কেননা তখনও যমুনার উৎপত্তি হয়নি। অথচ তারও অনেক আগের কবি শ্রীরায় বিনোদের কাব্য থেকে 'বঙ্গেশ্বরে'র নাম জানা যায়। এখনও এ-নদীপারের লোকেরা একে 'বঙ্কশ' (<বঙ্গশ< বঙ্গেশ বা বঙ্গেশ্বর) হিসেবেই অভিহিত করেন। যদিও শিক্ষিত সমাজে বা সাহিত্যে ব্যবহৃত এ-নদীর নাম—'বংশী' বা 'বংশাই'।

৮ক. বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ারস্ টাঙ্গাইল, পৃ. ৮-৯ দ্র.।

৮খ. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০-১১ দ্র.।

৯. টাঙ্গাইলের ইতিহাস, খন্দকার আবদুর রহিম, ১৯৯২, পৃ. ২৫৩ দ্র.।

১০. শ্রীরায় বিনোদ: কবি ও কাব্য, ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, ১৯৯১, পৃ. ৯ দ্র.।

১১. শ্রীরায় বিনোদ প্রণীত 'পদ্মাপুরাণ', ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া সম্পা, ১৯৯৩, পৃ. ৯০-৯১ দ্র.।

১২. টাঙ্গাইলের লোকসাহিত্য, মীর সোহরাব আলী, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১১ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

১২ক. টাঙ্গাইলের ইতিহাস (অপ্রকাশিত) প্রণেতা টাঙ্গাইলবাসী অধ্যাপক মুফাখ্খারুল ইসলামও এ-ধরনের মত ব্যক্ত করেন।

১৩. টাঙ্গাইল জেলার লোকসাহিত্য, মফিজুল ইসলাম সম্পাদিত, ১৯৯০, ভূমিকাংশ, পৃ. ৬৭।

১৪. টাঙ্গাইলের ইতিহাস, পৃ. ২৬২ দ্র.।

১৪ক. মওলানা ভাসানীর ব্যক্তিগত কার্যনির্বাহক ছিলেন মোসলেমউদ্দিন সরকার। ওই সময়ে তিনি অগ্নি থেকে রেহাই পাওয়া কিছু পুথি সংগ্রহ করেছিলেন।

১৪খ. মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত এ-প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে একটি প্রকল্প হিসেবে চালু রয়েছে।

১৪গ. প্রাক্তন এই অধ্যাপিকার নাম মিসেস খোদেজা জান্নাত। তিনি বর্তমানে ময়মনসিংহের ত্রিশালে বসবাস করছেন।

১৫. শ্রীরায় বিনোদ : কবি ও কাব্য, পৃ. ৪৩ দ্র.।

১৫ক. উল্লিখিত প্রবন্ধটি মুহম্মদ আসাদ সম্পাদিত ও হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত 'ইসলামী কালচার' পত্রিকায় ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৬. বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ'- কাব্যে বেউলা তার স্বামীর পুনর্জীবন-আশায় স্বর্গদাসী নেতার কাপড় কেচে দিয়েছে।শিবকে পরিতুষ্ট করার জন্য দেবসভায় বাঈজী-নাচ নেচেছে। নারায়ণদেব ও জানকীনাথ-এর 'পদ্ম-পুরাণ বা মনসামঙ্গল'-কাব্যে বেহুলা তার 'নয়ন কটাক্ষে' 'ক্ষীণকটি দোলায়' ও 'নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গি'তে দেবগণকে কামবাণে জর্জরিত করেছে। ওই একই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে তন্ত্র-বিভূতির 'মনসাপুরাণ'-কাব্যে বেহুলা নেতার পা ধরতেও সঙ্কোচবোধ করেনি।

১৭. ১৩৩২ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যের ভূমিকাংশে গ্রন্থ রচনার যে বয়সসীমা নির্ধারিত হয়েছে, সে সীমাকে বর্তমান পর্যন্ত প্রসারিত করলে গ্রন্থরচনার বয়সসীমা এ-রকমই দাঁড়ায়।

১৮. শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য।

১৯. পূর্বোক্ত, ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য।

২০. পূর্বোক্ত, ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য।

২১. বৈষ্ণব সমাজে দলাদলি, শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্তী, সাহিত্য, ১০ বর্ষ, ১১ সংখ্যা।

২১ক. ময়মনসিংহের বিবরণ, কেদারনাথ মজুমদার, ২য় সং, কলিকাতা, ১৯০৭, পৃ. ৪৫।

২২. সিরাজউদ্দীন চৌধুরীর প্রবন্ধ, মাসিক হিতকরী, ৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, পৃ. ৪।

২২ক. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, সুকুমার সেন, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ. ১৩৩ দ্র.।

২৩. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশচন্দ্র সেন, কলিকাতা, ১৯০৮, পৃ. ৩৫১।

২৪. ভবানীপ্রসাদ রায়ের 'দুর্গামঙ্গল', ব্যোমকেশ মুস্তফী সম্পা, ১৩২১ বঙ্গাব্দ, ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য।

২৪ক. পূর্বোক্ত, ভূমিকাংশ দ্র.।

২৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪২-১৪৩।

২৬. মালঞ্চ, সাদত কলেজের বার্ষিকী, ১৫ বর্ষ, ১২ সংখ্যা।

২৭. 'আদাজান গ্রামের পুরাতন অধিবাসী ঘোষ পরিবার নাকি রূপনারায়ণের উত্তর পুরুষ। ইহাদের কুল পঞ্জিকা অনুসারে ১৩০৪ বঙ্গাব্দের আধুনিক ঘোষ বংশধর হইতে অষ্টমপুরুষ ছিলেন রূপনারায়ণ।' বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩।

২৭ক. করটিয়ার সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের গ্রন্থাগারের পুথিশালায় সংরক্ষিত পুথির মধ্যে শ্রীরসিকচন্দ্র বসু সংগৃহীত এ-গ্রন্থের একটি খণ্ডিত পুথি রয়েছে।

২৮. প্রবন্ধটি সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ১৩০৪ বঙ্গাব্দে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

২৯. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃ. ১৪৩।

৩০. শ্রীরায় বিনোদ প্রণীত 'পদ্মাপুরাণ', পৃ. ৯০-৯১।

৩১. ধর্মীয় বিষয় দেশীয় ভাষা তথা বাংলা ভাষায় প্রচারের নিষেধবাণী উচ্চারণ করেছিল ব্রাহ্মণ্যবাদীরা। 'অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়াং মানব শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।।'
এ-কারণে বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ছিল সম্ভাবনাহীন।

৩২. শ্রীরামলোচন দাস প্রণীত 'শ্রীকল্কিপুরাণ', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২০ বঙ্গাব্দ, ভূমিকাংশ দ্র.।

৩৩. পূর্বোক্ত, ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য।

৩৪. পূর্বোক্ত, ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য।

৩৪ক. বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ারস, টাঙ্গাইল, পৃ. ২৭৭ দ্র.।

৩৫. টাঙ্গাইলের ইতিহাস, পৃ. ২৬৩ দ্র.।

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬০ দ্র.।

৩৬ক. বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ারস টাঙ্গাইল, পৃ. ২৭৭ দ্র।

৩৭. টাঙ্গাইলের ইতিহাস, পৃ. ২৬৩ দ্র.।

৩৮. টাঙ্গাইলের প্রাচীন কবি, ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, ফাল্গুনী, টাঙ্গাইল জেলা সমিতি, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৪১ দ্র,।

৩৮ক. বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ারস্ টাঙ্গাইল, পৃ. ২৭৭ দ্র.।

৩৯. টাঙ্গাইলের কবি-সাহিত্যিক, ফাল্গুনী, টাঙ্গাইল জেলা সমিতি, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৮৮ দ্র.।

৪০. টাঙ্গাইলের প্রাচীন কবি, পৃ. ৪১ দ্র.।

৪১. টাঙ্গাইলের কবি-সাহিত্যিক, পৃ. ৮৫ দ্র.।

৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪ দ্র.

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭ দ্র.

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬ দ্র.

৪৫. মনসাদেবীর সঙ্গে চাঁদ সওদাগরের ঝগড়া ও দ্বন্দ্ব, চাঁদ সওদাগরের সপ্তডিঙ্গা মধুকরের সমুদ্রে নিমজ্জন, চাঁদের ছয় ছেলের মৃত্যু, লৌহবাসর, বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের বিচ্ছেদ, লোহার বাসরঘরে লক্ষ্মীন্দরের সর্প দংশন, স্বামীর শবদেহ ভেলায় ভাসিয়ে বেহুলার নৃত্যগীত, বেইলার সতীত্বের মহিমায় লক্ষ্মীন্দরের জীবন প্রাপ্তি ইত্যাদি 'বেইলা নাচারি'র অন্তর্গত। ... কালিহাতী, ঘাটাইল, বাশাইল ও গোপালপুর থানার বিভিন্ন এলাকায় এ গানের আসর বেশ ঘটা করে করা হয়। আসরে সাদা ধুতি বা পাটলশাড়ী পরে একজন বেইলা সাজে। বেইলার পায়ে নূপুর বেঁধে সে হেলে দুলে নেচে নেচে গাইতে থাকে। বেইলার নাচারিতে একজন মূল গায়ক ও পাইল-দোহার থাকে কয়েকজন। (টাঙ্গাইলের লোকসাহিত্য, মীর সোহরাব আলী, বা. এ. পত্রিকা, ১১ বর্ষ, ২য় সংখ্যা)।

৪৬. শ্রীরায় বিনোদ: কবি ও কাব্য, পৃ. ৬৬ দ্র.

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬ দ্র.

৪৮. বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ারস্ টাঙ্গাইল, পৃ. ২৭৮ দ্র.।

৪৯. টাঙ্গাইলের কবি-সাহিত্যিক, পৃ. ৮৩ দ্র.

৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫ দ্র.

৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪ দ্র.

৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭ দ্র.

৫২ক. বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ারস্ টাঙ্গাইল, পৃ. ২৮১ দ্র.।

৫২খ. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৯ দ্র.।

৫৩. টাঙ্গাইলের লোক সাহিত্য, দ্রষ্টব্য।

৫৩ক. দক্ষিণ পাটনে যাত্রাকারী চান্দোর চৌদ্দডিঙ্গার দাঁড়ীদের কণ্ঠে সারিগান ধ্বনিত হয়েছিল। কবি শ্রীরায় বিনোদের কাব্যে এ-প্রসঙ্গটি উল্লিখিত হয়েছে।

সমুদ্রেত ডিঙ্গা চলে দাঁড়ী সব সারি বোলে
সদাগরে আনন্দিত মন। (পৃ. ১৯৫ দ্র.)

৫৪. টাঙ্গাইলের কবি-সাহিত্যিক, পৃ. ৮৬ দ্র.

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬ দ্র.

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪ দ্র.

৫৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫ দ্র.

৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯ দ্র.

৫৯. ময়মনসিংহের ইতিহাস, কেদারনাথ মজুমদার, পৃ. ১৮৫ দ্র.।

সহায়ক রচনাপঞ্জি :

১. 'পদ্মাপুরাণ' (শ্রীরায় বিনোদ প্রণীত), ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া সম্পাদিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৩ খ্রি:।

২. শ্রীরায় বিনোদ: কবি ও কাব্য, ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, বা/এ, ঢাকা, ১৯৯৩ খ্রি:।

৩. বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, আহমদ শরীফ, বর্ণ-মিছিল, ঢাকা, ১৯৭৮।

৪. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা. লি., কলিকাতা, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ।

৫. তন্ত্রবিভূতি-বিরচিত 'মনসাপুরাণ', ড. আশুতোষ দাস সম্পা., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৮০ খ্রি:।

৬. বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ', শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত সম্পা., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৬২ খ্রি:।

৭. নারায়ণদেব ও জানকীনাথ-এর 'পদ্মাপুরাণ', নিউ এ্যান্ড পাবলিকেশন্স, পঞ্চম সংস্করণ, ঢাকা, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ।

৮. শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, শ্রীমাধবাচার্য, বঙ্গবাসী কার্যালয়, ২য় সং, কলিকাতা, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।

৯. ময়মনসিংহের বিবরণ, কেদারনাথ মজুমদার, ২য় সং, কলিকাতা, ১৯০৭ খ্রি:।

১০. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ৩য় সং, কলিকাতা, ১৯০৮।

১১. ভবানীপ্রসাদ রায় প্রণীত 'দুর্গামঙ্গল', শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী সম্পা., বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩২১ বঙ্গাব্দ।

১২. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩য় খণ্ড, পূর্বার্ধ, কলিকাতা।

১৩. দুর্গামঙ্গল ও কবি রূপনারায়ণ (প্রবন্ধ), রসিকচন্দ্র বসু, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ।

১৪. বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ারস্ টাঙ্গাইল, ঢাকা, ১৯৯০।

১৫. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, সুকুমার সেন, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, কলকাতা, ১৯৭৮।

১৬. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, আশুতোষ ভট্টাচার্য, ৬ষ্ঠ সং, কলকাতা, ১৯৭৫।

১৭. শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ ও বৈষ্ণবতত্ত্ব, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৭৫।

১৮. বাংলা সাহিত্যের কথা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ২য় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৬৫।

১৯. শ্রীকল্কিপুরাণ, শ্রীরামলোচন দাস প্রণীত, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

২০. পূর্বোক্ত, 'মুখবন্ধ এবং গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থ পরিচয়'-অংশ।

২১. ফাল্গুনী, আ. ফ. ম. খলিলুর রহমান সম্পা., টাঙ্গাইল জেলা সমিতি, ঢাকা, ১৯৮৫ খ্রি:।

২২. টাঙ্গাইল জেলার লোকসাহিত্য (১ম খণ্ড), মফিজুল ইসলাম সম্পা., ঢাকা, ১৯৯০ খ্রি:।

২৩. টাঙ্গাইলের ইতিহাস, খন্দকার আবদুর রহিম, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৯২ খ্রি:

২৪. চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস, ড. আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, ঢাকা, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ

২৫. টাঙ্গাইলের লোক সাহিত্য [প্রবন্ধ], মীর সোহরাব আলী, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১১ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ।